বিদ্যাপতি

(পালা–নাটিকা)

চরিত্র : দেবী দুর্গা, দেবী গঙ্গা, কবি বিদ্যাপতি, শিবসিংহ (মিথিলার রাজা), লছমী (মিথিলার রানি), অনুরাধা (বিষ্ণু-উপাসিকা), বিজয়া (বিদ্যাপতির কনিষ্ঠা ভগ্নী), ধনঞ্জয় (রাজ–বয়স্য)।

প্রথম খণ্ড

কাল—পঞ্চদশ শতাব্দী

[মিথিলার কমলা নদীর তীরে বিসকি গ্রাম। তাহারই উদ্যানবাটিকায় দেবী দুর্গা–মন্দির। কবি বিদ্যাপতি দুর্গাস্তব গান করিতেছেন।]

(স্তব)

জয় জগজ্জননী, ব্রহ্মা–বিষ্ণু–মহেশ্বর–বন্দিতা,
জয় মা ত্রিলোকতারিণী।
জয় আদ্যাশক্তি পরমেশ্বরী নন্দনলোক–নন্দিতা
জয় দুর্গতিহারিণী॥
তোমাতে সর্বজীবের বসতি, সর্বাশ্রয় তুমি মা,
ক্ষয় হয় সব বন্ধন পাপতাপ তব পদ চুমি মা।
তুমি শাশ্বতী, সৃষ্টি–স্থিতি, তুমি মা প্রলয়কারিণী॥
তুমি মা শ্রদ্ধা প্রেমভক্তি তুমি কল্যাণ–সিদ্ধি,
ধর্ম–অর্থ–কাম–মোক্ষ তুমি তন–জন–ঋদ্ধি।
জয় বরাভয়া ত্রিগুণময়ী দশপ্রহরণধারিণী
জয় মা ত্রিলোকতারিণী॥

অনুরাধা : ঠাকুর ! ঠাকুর !
বিদ্যাপতি : (মন্দির–অভ্যন্তর হইতে) কে ?

অনুরাধা : আমি অনুরাধা, একটু বাইরে বেরিয়ে আসবে?

বিদ্যাপতি : (মন্দিরদ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া—বিরক্তির সুরে) একটু অপেক্ষা করলেই পারতে অনুরাধা। এত বড়ো ভক্তিমতী হয়ে তুমি মায়ের নামগানে বাধা দিলে?

অনুরাধা : আমায় ক্ষমা করো ঠাকুর। অত্যন্ত প্রয়োজনে আমি তোমার ধ্যানভঙ্গ করেছি। আমার কৃষ্ণগোপালের জন্য আজ কোথাও ফুল পেলাম না। তোমার বাগানে অনেক ফুল, আমার গিরিধারীলালের জন্য কিছু ফুল নেব? আমার গোপালের এখনও পূজা হয়নি।

বিদ্যাপতি : তুমি তো জান অনুরাধা, এ বাগানে ফুল ফোটে শুধু আমার মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য। এ ফুল তো অন্য কোনো দেবদেবীকে দিতে পারিনে! (মন্দিরদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন; মন্দির-অভ্যন্তরে স্তবপাঠের মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।)

অনুরাধা : (অশ্রুসিক্ত) ঠাকুর! ঠাকুর! তুমি কি সত্যই এত নিষ্ঠুর? তবে কি আমার ঠাকুরের পূজা হবে না আজ? আমার কৃষ্ণগোপাল! আমার প্রিয়তম! তুমি যদি সত্য হও আর আমার প্রেম যদি সত্য হয়, তা হলে আজ এই বাগানের একটি ফুলও অন্য কারুর পূজায় লাগবে না। এই বাগানের সকল ফুল তোমার চরণে নিবেদন করে গেলাম। (প্রস্থান)

বিদ্যাপতি : (গুনগুন স্বরে)

মা! আমার মনে আমার বনে
ফোটে যত কুসুমদল
সে ফুল মাগো তোরই তরে
পূজতে তোরই চরণতল॥

বিজয়া : দাদা। পূজার ফুল এনেছি। দোর খোলো।

বিদ্যাপতি : (দ্বার খুলিয়া) দে। বিজয়া, মা এখন কেমন আছেন রে?

বিজয়া : আমার তো ভালো মনে হচ্ছে না দাদা, কেমন যেন করছেন। আচ্ছা দাদা, অনুরাধা কাঁদতে কাঁদতে গেল কেন? তুমি কেন যেন তাকে দু-চোখে দেখতে পার না।

বিদ্যাপতি : হাঁ, আমি ওকে এক-চোখোমি করে এক চোখেই দেখি। আমি পূজো সেরেই আসছি। (বিজয়া চলিয়া গেল; বিদ্যাপতি মন্দিরদ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন; ভিতর হইতে স্তবপাঠের শব্দ শোনা গেল।)

বিদ্যাপতি : নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ—

[অন্তরীক্ষ হইতে প্রত্যাদেশ]

ক্ষান্ত হও বিদ্যাপতি! ও ফুল শ্রীকৃষ্ণ-চরণে নিবেদিত। বিষ্ণু-আরাধিকা যে ফুল শ্রীহরির চরণে নিবেদন করে গেছে, সে ফুল নেবার অধিকার আমার নেই।

বিদ্যাপতি : মা! মা! এ তোর মায়া, না সত্য?

দেবীদুর্গা : শোনো পুত্র! তুমি হয়তো জান না যে, আমি পরমা বৈষ্ণবী! জগৎকে বিষ্ণুভক্তি দান করি আমিই।

বিদ্যাপতি : তোর ইঙ্গিত বুঝেছি মহামায়া। তবে তোরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক ইচ্ছাময়ী। আমি আজ থেকে বিষ্ণুরই আরাধনা করব।

[গান]

আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপবো আমি শ্যামের নাম
মা হলো মোর মন্ত্রগুরু, ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম॥

বিজয়া : (কাঁদিতে কাঁদিতে) দাদা! দাদা! শিগরির এসো। মা আমাদের ছেড়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

বিদ্যাপতি : বিজয়া! বিজয়া! মা নেই, মা চলে গেলেন? (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া শান্ত স্বরে) হ্যাঁ,—মা তো আমার নেই। আমি এই মুহূর্তে মাতৃহারা হলাম। আমার ভুবনের মা আমার ভবনের মা, দু-জনেই একসঙ্গে ছেড়ে গেলেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

[মিথিলার রাজ-অন্তঃপুরের উদ্যানবাটিকা]

বিদ্যাপতি : মিথিলার রাজা শিবসিংহের জয় হোক!

রাজা শিবসিংহ : স্বাগত বিদ্যাপতি! বন্ধু! তোমার মাতৃশোক ভুলবার যথেষ্ট অবসর না দিয়ে স্বার্থপরের মতো রাজধানীতে ডেকে এনেছি। আমার অপরাধ নিয়ো না সখা।

বিদ্যাপতি : মহারাজ! আমি আপনার দাসানুদাস। শুধু আমি কেন, আমরা পুরুষানুক্রমে মিথিলার রাজ-অনুগ্রহে ও আশ্রয়ের স্নিগ্ধ শীতল ছায়ায় লালিত-পালিত। আপনার আদেশ আমার সকল দুঃখের ঊর্ধ্বে।

রাজা : তুমি জান সখা, রাজসভার বাইরে তুমি ওভাবে কথা বললে আমি কত বেদনা পাই। আমরা সহপাঠী বন্ধু, আমাদের সে বন্ধুত্বকে

আড়াল করে দাঁড়িয়েছে এই তুচ্ছ রাজ-সিংহাসন। আর তোমরা তো রাজ-অনুগৃহীত নও বন্ধু, মিথিলার রাজারাই তোমাদের কাছে ঋণী, অনুগৃহীত। তোমরা পুরুষানুক্রমে প্রধানমন্ত্রী হয়ে মিথিলার রাজা ও রাজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছ।

বিদ্যাপতি : আমায় ক্ষমা করো সখা। এই রাজসভার বাইরে যখন তোমায় দেখি, তখন ইচ্ছা করে তোমায় আগের মতো করেই বক্ষে জড়িয়ে ধরি। তবু কীসের যেন সংকোচ এসে বাধা দেয়।

রাজা : বিদ্যাপতি ! রাজা ও মন্ত্রীর সম্পর্ক ছাড়াও আমরা আজ বেদনার তীর্থে হয়ে গেছি এক পরমাত্মীয়। তুমি হারিয়েছ তোমার মাকে ; আমিও হারিয়েছি আমরা দেবতুল্য পিতা দেবসিংহকে।

রানি লছমী : তুমি তো শুধু রাজমন্ত্রীই নও বিদ্যাপতি। তুমি রাজকবিও। মিথিলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি !

বিদ্যাপতি : মহারানি এখানে আছেন, তা তো বল নাই সখা।

রাজা : রানি লছমী দেবীর অনুরোধেই তোমায় এত তাড়া দিয়ে এনেছি বন্ধু। তোমার কণ্ঠের গান না শুনলে নাকি ওঁর সে-দিনটাই ব্যর্থ। এত শ্রদ্ধা তোমার ওপর, তবু মাঝে ওই পর্দাটুকু উঠল না। ওই নিরর্থক লজ্জার আবরণ আমাকেই লজ্জা দেয় বেশি।

বিদ্যাপতি : দেবীরা চিরকাল যবনিকার অন্তরালেই থাকতে ভালোবাসেন, বন্ধু ! ওঁরা হলেন অন্তর-লোকের অসূর্যম্পশ্যা, বাইরের আলোর রূঢ়তা ওদের জন্য নয়।

রাজা : তবু যাকে দেখা যায় না, অথচ কথা শুনতে পাওয়া যায় তাকে যে লোক চিরকালই ভয় পেয়ে থাকে বিদ্যাপতি !

রানি লছমী : তার মানে আমি পেতনি, এই তো ! বেশ, আমি তাই। কবি ! আর কথা নয়, এবার আলাপন হোক শুধু গানে গানে।

বিদ্যাপতি : মহারানির আদেশ শিরোধার্য। কোন গান গাইব, দেবী ?

রানি : আমার সেই প্রিয় গান—'জনম জনম হাম রূপ নেহারলুঁ, ও গানটা আমার কাছে কখনও পুরানো হলো না।

বিদ্যাপতি :

[গান]

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ, নয়ন ন তিরপিত ভেল !
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখলুঁ, তবু হিয় জুড়ন ন গেল !
দেখি সাধ না ফুরায় গো !
হিয়া কেন না জুড়ায় গো
হিয়ার উপরে গিয়া
হিয়া তবু না জুড়ায় গো !

তৃতীয় খণ্ড

[অনুরাধার গীত]

সখি লো—
অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মানিক কো হরি লেল॥
(হরি হরিয়া নিল কে)
গোকুলে উছলল করুণাক রোল
নয়নক সলিলে বহয়ে হিলোল।
শূন ভেল মন্দির, শূন ভেল নগরী,
শূন ভেল দশদিশি শূন ভেল সগরী।
কৈছন যাওব যমুনা-তীর
কৈছে নেহারব কুঞ্জ-কুটির।
নয়নক নিন্দ গেও, বয়নক হাস,
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ, দুখ হম পাশ।
পাপ পরান মম আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুরে।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব
রাধারে কাঁদায়ে রহি দুরে॥

রানি : রাজা! কে যায় পথে অমন করুণ সুরে গান গেয়ে? ওকে এখানে ডাকো না!

বিদ্যাপতি : মহারানি! আমি ওকে জানি। আমি যেখানে যাই, ও আপনি এসে হয় আমার প্রতিবেশিনী। ওর নাম অনুরাধা। গিরিধারীলাল শ্রীকৃষ্ণ ওর জপমালা।

রানি : তা হলে তুমিই ওকে ডেকে আনো না, কবি!

বিদ্যাপতি : আমি যাচ্ছি দেবী, কিন্তু জানি না ও আসবে কি না।

(বিদ্যাপতির প্রস্থান)

রাজা : রানি! এখন বোধ হয় বুঝতে পেরেছ—বিদ্যাপতি হঠাৎ কেন বিষ্ণুউপাসক হয়ে উঠল!

রানি : সত্যিকার ভালো না বাসলে কারুর কণ্ঠ এত মধুময় এত আবেগবিহ্বল হয় না। ও যেন মূর্তিমতি কান্না।

(গান গাহিতে গাহিতে অনুরাধার প্রবেশ)

সজল নয়ন করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।

(যেন শত যুগ মনে হয়
তারে এক তিল না হেরিলে শত যুগ মনে হয়)
বিধি বড়ো দারুণ তাহে পুন ঐছন
দরহি করলুঁ মুরারি।
আন অনুরাগে পিয়া আনদেশে গেলা
পিয়া বিনু পাঁজর ঝাঁঝর ভেলা।
নারীর দীর্ঘশ্বাস পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া যার পাশে বইসে,
পাখি যদি হওঁ পিয়া পাশে উড়ি যাওঁ
সব দুখ কহু তার পাশে।
আনি দেহ মোর পিউ রাখহ আমার জিউ
কো আছ করুণাবান।

বিদ্যাপতি : বিদ্যাপতি কহে ধৈরজ ধরো চিত
তুরিতহি মিলব কান॥

রানি : অনুরাধা, কী মিষ্টি নাম তোমার! তুমি আমার কাছে থাকবে? বিদ্যাপতি! তুমি যদি অনুমতি দাও, অনুরাধাকে আমার কাছে রেখে শ্যামনাম শুনি।

বিদ্যাপতি : আমি তো ওর অভিভাবক নই; দেবী! ও আমার ছোটো বোন বিজয়ার বন্ধু।

রানি : ওর বাবা-মা কোথায় থাকেন?

বিদ্যাপতি : গতবার দেশে যখন মড়ক লাগে, তখন ওর বাবা-মা দুজনেই মারা যান। যে বিসকি গ্রাম মহারাজ আমায় দান করেছেন, ওর বাবা ছিলেন সেই গ্রামের বিষ্ণু-মন্দিরের পুরোহিত। এখন ওর অভিভাবিকা,
বন্ধু—সব বিজয়া।

রানি : ওর বিয়ে হয়নি?

বিদ্যাপতি : না। (হাসিয়া) ও বলে বিয়ে করবে না।

অনুরাধা : বা রে, আমি বুঝি তোমার গলা ধরে বলেছি যে, আমি বিয়ে করব না। না মহারানি, ঠাকুর জানেন না, আমার বিয়ে হয়েছে।

বিদ্যাপতি : তোমার বিয়ে হয়েছে? কার সাথে?

অনুরাধা : সে তুমি জান না, বিজয়া জানে।

রানি : আমিও হয়তো জানি। তুমি থাকবে ভাই আমার কাছে? আমার সখি হয়ে, আমার বোন হয়ে? আর তার বদলে আমি তোমার বরকে ধরে এনে দেব।

অনুরাধা : তা কি প্রাণ ধরে দিতে পারবে রানি। যে ঠাকুর আমার, সে যে তোমারও।

বিদ্যাপতি : মহারাজ! ওদের নিভৃত আলাপনের কমল-বনে আমাদের উপস্থিতি মত্ত মাতঙ্গের মতোই ভীতিজনক। আমরা একটু অন্তরালে গেলেই বোধ হয় সুশোভন হতো।

রাজা : চলো বিদ্যাপতি, তোমার ইঙ্গিতই সমীচীন।
(পশ্চাতে রানির ও অনুরাধার হাসির শব্দ)
কবি! এইখানে এসো! এই ঝোপের আড়াল থেকে ওদের দুই দেবীকে দিব্যচক্ষে দর্শন করা যাবে।

বিদ্যাপতি : মহারাজ, যে নিজে থাকতে চায় গোপন, তাকে জোর করে প্রকাশের বর্বরতা আমার নেই।

রাজা : আঃ! কবি হয়ে তুমি কী করে এমন বদরসিক হলে বলো তো? ওই দেবীর দল যখন চিকের আড়াল থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের দেখতে থাকেন তাতে কোনো অপরাধ হয় না, আর আমরা একটু আড়াল-আবডাল থেকে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? আরে এসো এসো।

চতুর্থ খণ্ড

রানি : (একটু দূরে) অনুরাধা, তোমার কবিকে দিয়ো আমার এই কণ্ঠহার!

অনুরাধা : রানি!

রানি : রানি নয় অনুরাধা, লছমী। তুমি আমায় লছমী বলে ডেকো। রানির কারাগারে আমার ডাক-নামের হয়েছিল মৃত্যু। তোমার বরে সে নাম আমার বেঁচে উঠুক।

অনুরাধা : লছমী! তুমি সত্যিই লছমী। রূপে লছমী, গুণে লছমী, গোলোকের অধীশ্বরী—লক্ষ্মী।

লছমী : আর তুমি বুঝি ব্রজের দূতী?

অনুরাধা : বেশ, তোমার দূতিয়ালিই করব। এই চাকরিই আমি নিলাম। তোমার কণ্ঠহার আমি যথাস্থানে পৌঁছে দেব, নিশ্চিন্ত থেকো।

(অনুরাধার গান)

ধন্য ধন্য ধন্য রমণী ধন্য জনম তোর।
সব জন কানু কানু করে ঝুরে
সে কানু তোর ভাবে বিভোর।

[উদ্যান-অন্তরালে বিদ্যাপতি ও রাজা শিবসিংহ]

রাজা : বিদ্যাপতি ! বিদ্যাপতি ! দেখেছ ? ওদের দুইজনের মুখে গোধূলির আলো পড়ে ঠিক বিয়ের কনের মতো সুন্দর দেখাচ্ছে। বিদ্যাপতি, বিদ্যাপতি, আরে তুমি যে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে গেলে !

বিদ্যাপতি : অপরূপ পেখলুঁ বামা।
কনকলতা অবলম্বনে উঠল
হরিণীহীন হিমধামা॥
[এ কী অপরূপ রূপ-ফাঁদ
স্বর্ণলতিকা ধরি উঠিয়াছে যেন ওই কলঙ্কহীন এ চাঁদ]
নলিন নয়ান দুটি অঞ্জনে রঞ্জিত
এ কী ভুরু-ভঙ্গিবিলাস,
চকিত চকোর জোড় বিধি যেন বাঁধিল
দিয়া কালো কাজরপাশ।
গুরু গিরিবর পয়োধর পরশিছে
গ্রীবার গজমোতি হারা,
কাম কম্বু ভরি কনক কুম্ভ পরি
ঢালে যেন সুরধুনী-ধারা।
পুণ্য প্রয়াগ-জলে যে করে যজ্ঞ শত
পায় এরে সেই বহুভোগী।
বিদ্যাপতি কহে, গোকুল-নায়ক
গোপীজন-অনুরাগী॥

রাজা : সাধু ! সাধু কবি ! বিদ্যাপতি ! এ কি তোমার গান, না তোমার আত্মার গান ?

পঞ্চম খণ্ড

[বিদ্যাপতি-ভবন]

বিদ্যাপতি : বিজয়া !

বিজয়া : দাদা ! ডাকচ !

বিদ্যাপতি : হ্যাঁ, অনুরাধা কোথায় রে ?

বিজয়া : কী জানি। সে কি বাড়ি থাকে ? কেন মরতে ওকে এনেছিলুম। সকাল হতে না হতে রানির যানবাহন এসে ওকে নিয়ে যায়। ও মাঝে মাঝে পালিয়ে আসে আমার কাছে, আর অমনি সাথে সাথে আসে রানির চেড়িদল। রানির অনুগ্রহ তাকে গ্রহের মতো গ্রাস করেছে।

বিদ্যাপতি : হুঁ। হ্যাঁরে বিজয়া, সেদিন অনুরাধা বলছিল ওর বিয়ে হয়ে গেছে! সত্যিই কি ওর বিয়ে হয়েছিল?

বিজয়া : (সক্রোধে) জানি না। আচ্ছা দাদা, তুমি কবি, সাধক—তুমি তো মানুষের অন্তরের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখতে পাও, অনুরাধার দিকে কখনও চোখ ফিরিয়ে দেখেছ কি?

বিদ্যাপতি : তা দেখিনি! কিন্তু ভুল তো তুইও করে থাকতে পারিস, বিজয়া, ওর স্বামী যদি থাকেই, সে পৃথিবীর মানুষ নয়, ওর স্বামী গিরিধারীলাল শ্রীকৃষ্ণ।

বিজয়া : হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ওই নামের ছলনা করে ও যাকে পূজা করে, আমি তাকে জানি। তুমি ইচ্ছা-অন্ধ, তাই দেখতে পাও না।

বিদ্যাপতি : তার মানে, তুই বলতে চাস, ওর প্রেমের জ্যোতি আমার চোখে পড়ে আমার দৃষ্টিকে ঝলসে দিয়েছে, এই তো?

বিজয়া : হ্যাঁ, ওর প্রেমের জ্যোতি এত প্রখর যে, সেই জ্যোতির পশ্চাতে বেদনাতুর নারীমূর্তিকে তুমি দেখতে পাচ্ছ না! আমি চললাম, দেখি হতভাগিনি কোথায় গেল!

[দূরে অনুরাধার গান]

সখী লো মন্দ প্রেম পরিণামা।
বৃথাই জীবন করলু পরাধীন,
নাহি উপকার একঠামা!
কেন বিধি নিরমিল এই পোড়া পিরিতি,
কাহে গড়িল মোরে করি কুলবতী।
বলিতে না পারি, হায় চলিতে না পারি,
পিঞ্জর মাঝে যেন বন্দিনী শারি॥

বিদ্যাপতি : অনুরাধা!

অনুরাধা : ঠাকুর!

বিদ্যাপতি : এ কী, তোমার চোখে জল কেন রাধা?

অনুরাধা : জল? কই, না তো! বিজয়া! (চলিয়া গেল)

বিদ্যাপতি : আমায় এ কী পরীক্ষায় ফেললে, প্রেমের ঠাকুর! তোমাতে নিবেদিত যে-প্রাণ সে-প্রাণ কেন এত বিচলিত হয় মানবীর চোখের জল দেখে?

বিজয়া : দাদা! রানির নাকি হুকুম, অনুরাধাকে এখন রাত্রেও রানির কাছে থাকতে হবে। এ রানির অত্যাচার। তুমি মিথিলার প্রধানমন্ত্রী, এর প্রতিকারের কি কোনো শক্তি নেই তোমার?

বিদ্যাপতি : অনুরাধাকে ডাকো তো। আমি সব শুনে ব্যবস্থা করছি।

বিজয়া : তোমায় ব্যবস্থা করতেই হবে, দাদা। নইলে আমিই রাজার কাছে আবেদন করব।

[বিদ্যাপতির গুনগুন স্বরে গান]

অনুরাধা : আমায় ডাকছিলে ঠাকুর? বিজয়া আমায় পাঠিয়ে দিলে।

বিদ্যাপতি : রাধা। রানি কি তোমায় রাত্রেও তাঁর কাছে থাকতে বলেছেন?

অনুরাধা : হ্যাঁ। রানি বলেন, দূতীর দূতিয়ালির প্রয়োজন রাত্রেই বেশি। তবে এ ওঁর আদেশ নয়, আবদার।

বিদ্যাপতি : কীসের দূতিয়ালি, রাধা?

অনুরাধা : ঠাকুর! তুমি আমায় কী মনে কর! পাগল, নির্বোধ বা ওইরকম একটা কিছু, না? তুমি যে এত যত্ন করে রোজ তোমার নবরচিত গানগুলি শেখাও, তুমি কি মনে কর আমি তার মানে বুঝি না? আর আমি কি শুধু রানির দূতিয়ালিই করি? আমি কি তোমার দূতিয়ালি করিনে?

বিদ্যাপতি : আমি তোমার কাছে আর আত্মগোপন করব না, রাধা। সত্যিই তোমার সুরের সেতু বয়ে হয় আমাদের মিলন। তবে, তুমি তো জান, আমার এ প্রেম নিষ্কলুষ, নিষ্কাম।—তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

অনুরাধা : বলো।

বিদ্যাপতি : তুমি কি সত্যিই আমায় ভালোবাস?

অনুরাধা : না।

বিদ্যাপতি : না? আঃ, তুমি আমায় বাঁচালে অনুরাধা।

অনুরাধা : তোমায় আমি ভালোবাসি না, কিন্তু আমি ভালোবাসি তাকে, যাকে তুমি ভালোবাস। ঠাকুর! ঠাকুর! আমাকে এই বর দাও যেন জন্মে জন্মে তোমার ভালোবাসার জনকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারি। তুমি যাকে ভালোবেসে সুখ পাও, তারই দাসী হতে পারি। আর দিনান্তে একবার শুধু ওই চরণ বন্দনা করতে পারি।

বিদ্যাপতি : অনুরাধা! এমনি করেই তুমি বৃন্দাবনে ললিতারূপে শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিবেদন করেছিলে। কোনোদিন শ্রীকৃষ্ণকে নিজের করে চাওনি। শ্রীকৃষ্ণের যাতে প্রীতি, সেই শ্রীমতীর সাথে বারে বারে তাঁর মিলন ঘটিয়েছিলে। তোমার সংযম ও তোমার প্রেমের কাছে সেদিন ভগবানের প্রেমও বুঝি হয়েছিল ম্লান।

বিজয়া : অনুরাধা! আজ কী গান শিখলি সই? এ কী, তুই মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে পড়ে কাঁদছিস? (সক্রোধে) দাদা!

বিদ্যাপতি : ভয় নেই বিজয়া; আমি ওকে আঘাত করিনি। (হাসিয়া) ওর দশা হয়েছে!

বিজয়া : অনুরাধা ! তুই যদি ফের দাদার কাছে আসিস, তা হলে তোর ওপর বড়ো দিব্যি রইল। চলে আয় ওখান থেকে !

[বিজয়ার গান]

তোরে সেই দেশে লয়ে যাব—
যথা না শুনিবি শ্যামনাম।
যথা শ্যামের স্মিরিতি নাই
শ্যামের পিরিতি নাই,
যথা বাজে না শ্যামের বাঁশি
নাই ব্রজধাম॥

ষষ্ঠ খণ্ড

[রাজ-উদ্যান—প্রভাত]

রাজা : আমার মুখের দিকে অমন হাঁ করে চেয়ে কী দেখছ ধনঞ্জয় ?

ধনঞ্জয় : ভয় নেই মহারাজ ! ভয় নেই ! আপনি মেঘ নন, আর আমিও চাতক পক্ষী নই। মহারাজ যদি অভয় দেন, তা হলে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাজা : (হাসিয়া) তুমি আমার বয়স্য। তোমার তো সাতখুন মাপ। বলো কী বলতে চাও—

ধনঞ্জয় : মহারাজ ! বৃন্দাবনের আয়ান ঘোষের সাথে আপনার কি কোনো কুটুম্বিতা ছিল ?

রাজা : তার মানে ?

ধনঞ্জয় : তার মানে আর কিছু নয়, মহারাজ ! চেহারা তো দেখিনি, তবে তার বুদ্ধির সঙ্গে আপনার বুদ্ধির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।

রাজা : (সক্রোধে) ধনঞ্জয় !

ধনঞ্জয় : দোহাই মহারাজ ! আমার মাথা কাটা যাক, তাতে দুঃখ নেই ; কিন্তু আপনার অরসিক বলে বদনাম রটলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে !

রাজা : (হাসিয়া) আচ্ছা বলো, কী বলছিলে ?

ধনঞ্জয় : আমি বলছিলাম মহারাজ, আপনার ওই প্রধানমন্ত্রী বিদ্যাপতির কথা। ছিলেন দুর্গা-উপাসক ঘোর শাক্ত, হলেন পরম বৈষ্ণব, কৃষ্ণভক্ত। ছিলেন রাজমন্ত্রী—কঠোর রাজনীতিক, হলেন কবি—শান্তকোমল প্রেমিক।

রাজা : তাতে তোমার কি ক্ষতিবৃদ্ধি হলো, ধনঞ্জয় !

ধনঞ্জয় : কিছু না, মহারাজ ! ক্ষতিবৃদ্ধি যা হবার, তা হচ্ছে রাজার, আর তাঁর রাজ্যের। এ-ক্ষতিও হচ্ছিল এতদিন গোপনে, তাকেও দিনের আলোকে টেনে আনলে বিন্দে-দূতী।

রাজা : বিন্দে-দূতী? সে আবার কে?

ধনঞ্জয় : আজ্ঞে ওই হলো, আপনারা যাকে বলেন অনুরাধা, আমাদের মতো দুর্জন তাকেই বলে বিন্দে-দূতী।

রাজা : অর্থাৎ সহজ ভাষায় তোমার কথার অর্থ এইযে, কবি বিদ্যাপতি হচ্ছেন নন্দলাল, আমি হচ্ছি আয়ান ঘোষ, আর শ্রীমতী হচ্ছেন—

ধনঞ্জয় : দোহাই মহারাজ ! মাথা আর ঘাড়ের সন্ধিস্থলে বিচ্ছেদের ভয় যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ ও-পাপ কথা কোন সাহসে উচ্চারণ করি !

রাজা : ধনঞ্জয়, আয়ান ঘোষের গোপ-বুদ্ধি আর তোমাদের রাজার ক্ষাত্র-বুদ্ধিতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তোমরা কী বোঝ জানি না, আমি কিন্তু সব শুনি, সব দেখি, সব বুঝি।

ধনঞ্জয় : মহারাজ পরম উদার। আপনার ধনবল জলবলও অপরিমাণ, তবু মহারাজ, জটিলা-কুটিলার মুখ বন্ধ করতে তা কি যথেষ্ট?

রাজা : দেখো ধনঞ্জয়, চোর যতক্ষণ ঘরের আশেপাশে ঘোরে, ততক্ষণ জাগ্রত বলবান গৃহস্থ তাকে ভয় করে না। হ্যাঁ, তবে তাকে লক্ষ রাখতে হয় যে, ঘরে সিঁদ না কাটে। তা ছাড়া, এইসব নখদন্তজীব কবিদের নিরুপদ্রব প্রেমকে আমার ভয় নেই। ওরা দূরে থেকে খানিক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে, দুটো কবিতা কী গান লিখবে, ব্যাস ! ওর চেয়ে এগিয়ে যাবার দুঃসাহস ওদের নেই ! তুমি কি এর বেশি কিছু লক্ষ করেছ?—

ধনঞ্জয় : আজ্ঞে, তা মিথ্যে বলতে পারব না। মহারানি প্রত্যহ রাজসভায় এসে চিকের আড়াল টেনে বসেন হয়তো রাজকার্য দেখতেই এবং সে চিক গলিয়ে একটা চামচিকেরও যাবার উপায় নেই। তবু বিদ্যাপতির ওই পর্দামুখী আসনটা অনেকেরই চক্ষুশূল-স্বরূপ হয়ে উঠেছে।

রাজা : ধনঞ্জয় ! আমি লক্ষ রেখেছি বলেই ওদের মাঝের পর্দাটুকু আজও অপসারিত হয়নি। তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো, আর সকলকে জানিয়ে দিয়ো যে, ওদের চেয়ে আমার দৃষ্টির পরিসর অনেক বেশি। ওরা দেখে শুধু রাজসভা আর রাজ-অন্তঃপুর, আর আমাকে দেখতে হয় সমগ্র রাজ্য।

ধনঞ্জয় : আচ্ছা মহারাজ ! তারই পরীক্ষা হোক।

রাজা : কী পরীক্ষা করবে বলো তুমি?

ধনঞ্জয় : আমি বলি কি, কোনোরকমে দিন-কতকের জন্য রানিকে আটকে রাখুন, তিনি যেন রাজসভায় না আসেন। তারপর রানির অবর্তমানে বিদ্যাপতিকে কিছু নতুন পদ রচনা করে গাইতে বলুন। মহারাজ, আপনার অনুগ্রহে প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠেছেন প্রধান গায়ক, আর রাজসভা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাবাজির আখড়া। মহারাজ, দাসের অপরাধ নেবেন না।

রাজা : তোমার ইঙ্গিত বুঝেছি। আচ্ছা ধনঞ্জয়, তাই হবে।

ধনঞ্জয় : যাবার বেলায় একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই মহারাজ, একদা শ্যাম বনে গিয়ে শ্যামারূপ ধারণ করে আয়ান ঘোষের চোখে ধুলো দিয়েছিলেন।

রাজা : আমার চোখের পর্দা আছে ধনঞ্জয়। এ-চোখে কেউ ধুলো দিতে পারবে না।

সপ্তম খণ্ড

[বিদ্যাপতির বাটীর পুষ্পোদ্যান]

অনুরাধা : ঠাকুর ! আজ দু-দিন থেকে তোমার মুখে হাসি নেই, চোখে দীপ্তি নেই, কণ্ঠে গান নেই। কী হয়েছে তোমার ?

বিদ্যাপতি : কেন তুমি ছলনা করছ অনুরাধা ? তুমি তো সবই জান। আজ দু-দিন ধরে রাজসভায় আমার লাঞ্ছনার আর সীমা নেই। এই দু-দিন রাজাকে একটি নূতন পদও শোনাতে পারিনি। আর তাই নিয়ে শত্রুপক্ষ আমায় বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছে।

অনুরাধা : হা হরি ! এ দু-দিনে একটা গানও লিখতে পারলে না ? তোমার সুরের ঝরনা হঠাৎ এমন শুকিয়ে গেল কেন ?

বিদ্যাপতি : তুমি তো জান রাধা, আমার কাব্যের প্রেরণা, সুরের প্রাণ সবই লছমী দেবী। যেদিন তাঁর উপস্থিতি অনুভব না করি, সেদিন আমার দুর্দিন। সেদিন আমার কাব্যলোকে, সুরলোকে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ !

অনুরাধা : আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো রানিকে একটুও দেখতে পাও না, তবু কী করে বুঝতে পার যে রানি রাজসভায় এসেছেন ? রানি কি কোনো ইঙ্গিত করেন ?

বিদ্যাপতি : না না, অনুরাধা, লছমী তো ইঙ্গিতময়ীরূপে দেখা দেননি আমায়, তিনি আমার অন্তরে আবির্ভূতা হন সংগীতময়ীরূপে। তাঁর আবির্ভাব অনুভব করি আমি আমার অন্তর দিয়ে। যেদিন রানি রাজসভায় আসেন, সেদিন অকারণ পুলকে আমার সকল দেহমন

বীণার মতো বেজে ওঠে। শত গানের শতদল ফুটে ওঠে আমার প্রাণে। আমি তখন আবিষ্টের মতো গান করি। সে আমার আত্মার গান নয়, ও গান পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণের গান!

অনুরাধা : ঠাকুর, আমার প্রণাম নাও। তোমার পা ছুঁয়ে আমি ধন্য হলাম। আমি কাল ভোরেই তোমাকে দেখাব তোমার কবিতালক্ষ্মীকে।

বিদ্যাপতি : পারবে? পারবে তুমি অনুরাধা? (হঠাৎ আত্মসংবরণ করিয়া) এ কী করে সম্ভব হবে জানিনে, তবু জানি রাধা—এ শুধু তোমার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। তুমিই আমার বন্ধ-স্রোত সুরধুনীকে মুক্ত করতে পার।

অনুরাধা : উতলা হোয়ো না ঠাকুর! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আমি দূতী, আমার অসাধ্য কিছু নেই।

বিদ্যাপতি : অনুরাধা, তুমি হয়তো মনে করছ, আমি কী ঘোর স্বার্থপর, পাষণ্ড, তাই না?

অনুরাধা : নিশ্চয়ই! পাষাণ না হলে ঠাকুর হবে কী করে? শুধু নেবে, দিতে জানবে না, মাথা খুঁড়ে মরলেও থাকবে অটল, তবে তো হবে দেবতা, তবেই না পাবে পূজা!

বিদ্যাপতি : অনুরাধা! আমি যদি তোমার প্রেমের এক বিন্দুও পেতাম, তা হলে আজ আমি জগতের শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারতাম।

অনুরাধা : না ঠাকুর, তা হলে তুমি হতে আমার মতোই উন্মাদ। সকলের আকাঙ্ক্ষা সমান নয়, ঠাকুর! কেউ বা পেয়ে হয় সুখী, আর কেউ বা সুখী হয় না-পেয়ে—

বিদ্যাপতি : তোমার প্রেমই প্রেম, অনুরাধা, যা পায়ে শৃঙ্খলের মতো জড়িয়ে থাকে না, সে প্রেম দেয় অনন্তলোকে অনন্ত-মুক্তি।

অনুরাধা : অত শত ঘোর-প্যাঁচের কথা বুঝিনে, ঠাকুর। আমি ভালোবেসে কাঁদতে চাই, তাই কাঁদি। বুকে পেলে কান্না যাবে ফুরিয়ে, প্রেম যাবে শুকিয়ে—তাই পেতে চাইনে। বুকের ধনকে বিলিয়ে দিই অন্যকে। আমি চললাম ঠাকুর, আমি চললাম। আমি কাল সকালে তোমার কবিতালক্ষ্মীকে দেখাব!

[অনুরাধার গান]

হাম অভাগিনি, দোসর নাহি ভেলা।
কানু কানু করি যাম বহি গেলা।
মনে মোর যত দুখ কহিব কাহাকে।
ত্রিভুবনে যত দুখ নাহি জানে লোকে।
জনম অবধি মোর এই পরিণাম
আমিই চাহিব শুধু, চাহিবে না শ্যাম!

বিদ্যাপতি : ভণয়ে বিদ্যাপতি, শুন ধনি রাই,
কানু সমঝাইতে হাম চলি যাই॥

অষ্টম খণ্ড

[রাজ-অন্তঃপুর]

[অনুরাধার গান]

এ ধনি করো অবধান
তোমা বিনা উনমত কান॥
(কানু পাগল হল গো
তোমারে না হেরি কানু পাগল হলো গো)

রানি : কানু পাগল হলো, না তুই পাগল হলি অনুরাধা?

অনুরাধা : (গান) শুন শুন গুণবতী রাধে।
মাধবে বধিয়া তুই কী সাধিবি সাধে?
(তুই কোন সাধ সাধিবি?
মাধবে বধিয়া তুই কোন সাধ সাধিবি?)

রানি : সতিনকে কাঁদাব! বুঝলি?

অনুরাধা : (গান) এতহুঁ নিবেদন করি তোরে সুন্দরী
জানি ইহা করহ বিধান।
হৃদয়-পুতলি তুহুঁ সে শূন্য কলেবর
তুহুঁ বিদ্যাপতি-প্রাণ।

রানি : আ মল! বিদ্যাপতি-বিদ্যাপতি বলে ছুঁড়ি যে নিজেই পাগল হলি! বিদ্যাপতির বিদ্যাটুকু বাদ দিয়ে তাঁর ঘর জুড়ে বসলেই তো পারিস।

অনুরাধা : তা হলে তোমার কী দশা হবে সখী?

রানি : এক কৃষ্ণকে নিয়ে ষোলো হাজার গোপিনী যদি সুখী হতে পারে, আমরা দু'জন আর সুখী হতে পারব না?

অনুরাধা : সেই প্রেমময়ী গোপিনীদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি ভাই! আমরা তাঁদের পায়ের ধুলো হবারও যোগ্য নই।

রানি : সে-কথা যাক। অনুরাধা, আমার একটা কথা জানতে বড়ো সাধ হয়। তিনি কি একবারও তোকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন না?

অনুরাধা : একবারও না।

রানি : না ভাই লক্ষ্মীটি, লুকোসনে। মহারাজার আদেশে আমি আজ দু-দিন রাজসভায় যেতে পাইনি। তাঁকে একবার দেখতে পাইনি, তাঁর গান শুনিনি। মনে হচ্ছে যেন তাঁকে কত জন্ম দেখিনি।

অনুরাধা : তারও ওই দশা! রোজ নতুন গান লিখেই চিৎকার করে আমায় ডাকতে থাকে—ওই গানটা লিখে নেবার জন্য। আজ দু-দিন বেচারি একেবারে নিশ্চুপ।

রানি : হুঁ। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আচ্ছা, গান লিখিয়ে সে আমার কাছে গাইতে বলে না?

অনুরাধা : উঁহু।

রানি : দূর পোড়ারমুখি! সত্যি বলো না ভাই, মাথা খাস।

অনুরাধা : তুমি যদি কাল ভোরে ঠিক এইখানে—এই মাধবীকুঞ্জে তাকে দেখতে পাও, তাহলে কী করবে?

রানি : তোর মনের কথা হয়তো বুঝেছি। আচ্ছা অনুরাধা, বিদ্যাপতি তোর বর হলে তুই কী করিস বলো তো।

অনুরাধা : রান্না করি, কান্না করি। মাঝে-মাঝে ঝগড়া করি, কাজে বাগড়া দিই, আর রাত্তির বেলায় পা টেপাই।

রানি : দোহাই তুই থাম। তোর মুখে যে পোকা পড়বে। তুই কী লো?

অনুরাধা : তোমার বোন—সতিন। আর সতিনে নাড়ে-চাড়ে, বোন সতিনে পুড়িয়ে মারে। আচ্ছা ভাই লক্ষ্মী, তুমি যদি ওকে পাও তা হলে কী কর?

রানি : আমার ঠাকুর ঘরে রেখে পূজা করি।

অনুরাধা : মাগো কী শাস্তি!

রানি : শাস্তি কী লো?

অনুরাধা : শাস্তি নয় তো কী? রাতদিন পাষাণ-মূর্তি হয়ে তোমার মন্দিরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, হাঁটু ভেঙে গেলেও বসতে পারবে না, একে শাস্তি ছাড়া কী বলব?

রানি : তবে কি তুই বলিস বুকে পুরে রাখতে, কিংবা দিন-রাত মান-অভিমানের পালা গাইতে?

রাজা : রানি, তোমাদের পালা-গানে কি আমি দোয়ারকি করতে পারি! যেয়ো না অনুরাধা, আমাদের মতন দু-চার জন দুর্জন বাধা জমায় বলেই প্রেমের আকর্ষণী সংগীত এত বেড়ে যায়। প্রেম যখন গদাই-লশকরি ঢিমেতালে চলতে থাকে, তখন তার শত্রুপক্ষই ন্যাজ মলে তাকে তাতিয়ে তোলে।

অনুরাধা : মহারাজ কি আমায় লছমী দেবীর ছোটো বোন মনে করেছেন?

রাজা : আরে, সে সৌভাগ্য হলে তো তোমায় ডাইনে নিয়ে বসতাম। লছমী দেবী বামে বসে হতেন বামা-আর তুমি হতে ডাইনে।

অনুরাধা : আর এই দুই অবলার মাথায় চাঁটি দিয়ে মহারাজ হতেন অবলাবাদক, না? তা মহারাজ যখন এমন মধুর অধিকারই

দিলেন—তখন আবার বলতে ইচ্ছে করছে—আমি তা হলে আপনাকে নিয়ে সেতারের সুর বাঁধা অভ্যাস করতাম!

রাজা : রানি, তোমার এই সখীটি যেমন মুখরা, তেমনই রসিকা। আর, হবে না? কবির কাছে তালিম পাচ্ছে।

রানি : রাজা, রাজা, তুমি হাসছ—, কিন্তু তোমায় এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন? তোমার চোখে মুখে রক্ত নেই!

রাজা : ঠিক মড়ার মতো, না রানি? ওটা তোমার চোখের ভুল। রানি, আমার একটা কথা রাখবে?

রানি : বলো।

রাজা : আমাকে কাল ভোরেই যেতে হবে আমার রাজ্যের সীমান্ত পেরিয়ে। আমি যখন থাকব না, তখন যেন আমার প্রিয় সখা বিদ্যাপতির কোনো অযত্ন না হয়।

রানি : আমি বুঝতে পারছি, রাজা। তুমি অসুস্থ, তুমি একটু চুপ করে শোও। তোমার সেবা করার কর্তব্য থেকে আমায় বঞ্চিত কোরো না।

রাজা : কর্তব্য-সেবা-তাই করো রানি, তাই করো! লোকে যা চায় ভগবান তাকে তার সব কিছু দেন না। এই বঞ্চিত করেই তিনি টেনে নেন সেই হতভাগ্যকে তাঁর শান্তিময় কোলে। যাকে ভালোবাসার কেউ নেই, সে যদি ভগবানের চরণে আশ্রয় না পায় তার মতো দুর্ভাগা বুঝি আর কেউ নেই।

রানি : তুমি কবে ফিরবে?

রাজা : বহুবার তো গেছি রানি, আবার ফিরে এসেছি। আবার হয়তো আসব তোমার সেবা নিতে। তোমায় বঞ্চিত আমি করব না।

রানি : রাজা! তুমি কেন অমন করছ? তোমার সেই বুকের ব্যথাটা বুঝি আবার বেড়েছে! ভোর হয়ে এলো, তুমি একটু চুপ করে শোও, আমি আসছি এখনই!

নবম খণ্ড

[রাজ-উদ্যান, প্রভাত]

বিদ্যাপতি : মহারাজ! আমি গান শোনাতে এসেছি। আজ আমার গানের বাঁধ, প্রাণের বাঁধ, সুরের বাঁধ ভেঙে গেছে। ভগীরথের মতো সুরের অলকানন্দাকে আমি আহ্বান করে এনেছি।

রাজা : এসো! এসো বন্ধু, এসো বিদ্যাপতি! এত আনন্দ তো তোমার কোনোদিন দেখিনি বিদ্যাপতি! আজ তিন দিন ধরে তুমি ছিলে

বাণীহীন, মূক। হঠাৎ আজ ভোরে তোমার এত কবি-প্রেরণা এলো কোত্থকে, বলো তো?

বিদ্যাপতি : তা জানি না মহারাজ, আমার প্রাণ শোনাতে চায় গান। নিখিল জগৎকে আজ সে গানে গানে পাগল করে দিতে চায়, ডুবিয়ে দিতে চায়, ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। আজ আর তোমার আদেশের অপেক্ষা রাখব না রাজা, আজ গান গাইব স্বেচ্ছায়!

[গান]

আজু রজনি হাম ভাগে পোহায়লুঁ—
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশি ভেল নিরদ্বন্দ্বা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥
সোই কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ
মলয় পবন বহু মন্দা॥
অব মঝু যব পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহুঁ মানব নিজ দেহা।
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা॥

রাজা : অপূর্ব! সাধু কবি, সাধু! তুমি শুধু রানির কণ্ঠহার পেয়েছিলে, আজ তোমায় রাজার কণ্ঠহার দিয়ে ধন্য হলাম। লজ্জিত হোয়ো না কবি, তোমার বুকের তলে যে লুকানো থাকে রানির দেওয়া কণ্ঠহার, সেকথা আর কেউ না জানলেও আমি জানি। এই রাজ-উদ্যানে এত ভোরে তুমি আমি ছাড়া তো আর কেউ নেই বন্ধু! আর, অন্তরালে যদি কেউ থাকেনই, তিনি তোমার আত্মীয় নন। বিদ্যাপতি, অন্তরিক্ষের দেবী চোখের সুমুখে এসে আবির্ভূতা না হলে মানুষের কণ্ঠে এমন গান আসে না। দেবীর দয়া বন্ধু, এ দেবীর দয়া।

বিদ্যাপতি : মহারাজ কি আমায় বিদ্রূপ করছেন? তা করুন, তবু আমার আজকের আনন্দকে মলিন করতে পারবেন না। এ আনন্দ এই শুভ্র প্রভাতের মতোই অমলিন।

রাজা : তা জানি বলেই তোমায় শ্রদ্ধা করে আজও বন্ধু বলেই সম্ভাষণ করি বিদ্যাপতি !... আজ থেকে আমার রাজ্যে তুমি পরিচিত হবে 'কবি-কণ্ঠহার' নামে।

দশম খণ্ড

[দৃশ্য পূর্ববৎ]

ধনঞ্জয় : এই কণ্ঠহার-এর মাঝে এই অধম কণ্টক-হাড় কি আসতে পারে, মহারাজা ?

রাজা : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই ! এসো ধনঞ্জয় এসো ! আজ আমার সভাকবির পরিপূর্ণ প্রকাশের শুভ প্রভাত। এই শুভ প্রভাতে আমি কবিকে দিয়েছি আমার কণ্ঠহার। প্রার্থনা করো, যেন আমার সভাকবির আসন হয় বিশ্ব কবি-সভার সর্বোচ্চ স্থানে।

ধনঞ্জয় : ও-রকম প্রার্থনা আমি করব না, মহারাজ ! মানুষের আসনের উচ্চতার একটা সীমা আছে, তাকে অতিক্রম করে বসলেই আমরা তাকে বলি শাখা-মৃগ। যাক। মহারাজের আজকের আনন্দটা কি সত্যিকার ?

বিদ্যাপতি : তুমি তা বুঝবে না ধনঞ্জয়। যে প্রদীপ তিলে তিলে পুড়ে বুকের স্নেহ-রসকে জ্বালিয়ে অপরকে দান করে আলো, সেই প্রদীপই জানে এই আত্মদানের—আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার কী অপার আনন্দ !

রাজা : ঠিক বলেছে কবি—আরতির প্রদীপ নিববার আগে যেমন করে শেষবার তার উজ্জ্বলতম শিখা মেলে দেবতার মুখ দেখে নিতে চায়--তেমনি করে আমার অন্তর-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখে নিতে চাচ্ছে আমার শ্রান্ত প্রাণ-শিখা। তুমি এমন গান শোনাতে পার কবি, যা আমার অন্তিম সময়ে শুনতে ইচ্ছা করবে ?

ধনঞ্জয় : মহারাজ ! এইবার কিন্তু অরসিকের মতো কথা আরম্ভ হল এবং কাজেই আমাকে সরে পড়তে হলো।

রাজা : ধনঞ্জয় ! ধনঞ্জয় চলে গেলে ? আঃ বাঁচলাম ! বিদ্যাপতি, আমায় একটু ধরবে ? এখানে উঠে এলাম কী করে জানিনে, আর বোধ হয় এখান থেকে উঠে যেতেও পারব না !

বিদ্যাপতি : তুমি এমন করছ কেন সখা ? তোমার কি কোনো অসুখ করেছে ?

রাজা : সখা ! প্রেমের বৃন্দাবন ; আমরা—আমি, তুমি, লছমী, অনুরাধা—জনম জনম ধরে লীলা-সহচর-সহচরী। সেই প্রেমলোকের গান

যেদিন তুমি প্রথম শুনালে, সেই দিন আমার মনে পড়ে গেল প্রেম-লোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে। তুমি কাকে লক্ষ করে সে গান লিখেছিলে জানিনে, কিন্তু তোমার গানের মন্ত্রে আমি উপাসনা করতে লাগলাম—রাধাশ্যামের যুগলমূর্তি। আমি আমার উপাস্য দেবতাকে পেয়েছি, তাই তাঁর বিরহ আর সহ্য করতে পারছিনে, বন্ধু! আমি আমার কানুর বাঁশরি শুনতে পেয়েছি।

বিদ্যাপতি : রাজা!

রাজা : (হাসিয়া) তুমি ঠকে গেলে বন্ধু! তুমি গড়লে তরণি, আর আমি তাই চুরি করে গেলাম বৈতরণি পেরিয়ে। বিদ্যাপতি! তুমি কাঁদছ? কেঁদো না সখা, তুমিও আসবে দু-দিন পরে আমাদের চির-লীলানিকেতন বৈকুণ্ঠধামে। জানো বিদ্যাপতি, কাল সারারাত্রি ঘুমোইনি, আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে ডেকেছি আর কেঁদেছি। আজ ভোরে সেই অশান্তের আহ্বান ভেসে এলো কানে—'ওরে আয়, আমার প্রিয় আমার বুকে চলে আয়!' রানি বলছিলেন রাজবৈদ্যকে খবর দিতে, এমন সময়ে এলে তুমি—ভবরোগের বৈদ্য। তুমি এখন গাও সখা—আমার মাধবের নাম গান—

[বিদ্যাপতির গান]

মাধব, বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসীতিল দেহ সমর্পলুঁ—
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গণইতে দোষ গুণ-লেশ না পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার,
তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ-বাহির নহি মুই ছার॥
কিয়ে মানুষ পশু পাখি কিয়ে জনমিয়ে
অথবা কীটপতঙ্গ
করম-বিপাকে গতায়তি পুন পুন
মতি রহু তুয়া-পরসঙ্গ!
ভনয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু—
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

রাজা : আহা, আবার বলো সখা—আবার বলো :
মাধব! তরইতে ইহ ভবসিন্ধু—

তুয়া পদপল্লব করি অবলম্বন
তিল-এক দেহ দীনবন্ধু !
আঃ আমার মাথা কার কোলে ?

রানি : রাজা ! আমি দাসী—লছমী।

রাজা : লছমী ! ওঃ ! কে কাঁদে আমার পায়ে পড়ে ?

অনুরাধা : রাজা ! আমি, আমি-অনুরাধা। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু-উপাসক, পরম প্রেমিক—তুমি, আমায় পায়ের ধুলো দিয়ে যাও, আমি ওই চরণধূলির প্রসাদে—মুক্ত হয়ে যাই !

রাজা : অনুরাধা ! আমি যে কৃষ্ণকে পেয়েছি ধ্যানে, সে কৃষ্ণকে তুমি যে রেখেছ বুকে পুরে। অনুরাধা-অনুরাধা—কী মধুর নাম ! এই তো আমার বৃন্দাবন। বিদ্যাপতি, নারায়ণ, লছমী, অনুরাধা—কৃষ্ণনাম গান—এরই মাঝে যেন জন্মে জন্মে আসি—শ্রীকৃষ্ণ মাধব মা-ধ-ব..(রাজার মৃত্যু)

বিদ্যাপতি, অনুরাধা, লছমী : রাজা ! রাজা ! (এক সঙ্গে চিৎকার)

একাদশ খণ্ড

(বিদ্যাপতির ভবন—নিশীথ রাত্রি)

[অনুরাধার গান]

মাধব ! কত পরবোধব রাধা !
হা হরি হা হরি কহতহি বারবার
অব জিউ করব সমাধা॥
ধরণি ধরিয়া ধনি জতনহি বইসই
পুনহি উঠই নাহি পারা,
সহজহি বিরহিণী জগমাহা তাপিনী
বৈরী মদন-শরধারা।
অরুণ নয়ন-লোর তীতল কলেবর
বিলোলিত দীঘল কেশা।
মন্দির বাহির করইতে সংশয়
সহচরী গণতমি শেষা॥

বিদ্যাপতি : অনুরাধা ! তুমি একা এখানে গান করছ ? বিজয়া কোথায় ?

অনুরাধা : জানি না ঠাকুর ! তোমায় রানি ডাকছেন। একবার যাবে ?

বিদ্যাপতি : রানি—আমায় ডাকছেন ? এত রাত্রে ? কেন বলো তো ?

অনুরাধা : ভয় হচ্ছে, না আনন্দ?

বিদ্যাপতি : দুই-ই-ই! রাজা শিবসিংহের স্বর্গারোহণের পর এক বৎসর কাল রানির প্রতিভূ হয়ে রাজ্য চালালাম, এই এক বৎসর অবগুণ্ঠিতা রানির মুখের দিকে চাইতে পারিনি। কেবলই ভয় হয়েছে, যদি রানির চোখে চোখ পড়ে—আর চোখ ফিরাতে না পারি। তাই নতনেত্রে—কর্তব্য করে গেছি। রাজ-সিংহাসনে দেখেছি শুধু দু-খানি নিরাভরণ রাঙাচরণ, আর মনে হয়েছে ও চরণ সত্যসত্যই সকল দেবতার আরাধেয়। এই এক বৎসর রানি আমায় কেবল আদেশই করেছেন—রানির মতো মহাগম্ভীর কণ্ঠে! তাই অনুরাধা, আজ এই অন্ধকার নিশীথে তাঁর ডাক শুনে ভয় আনন্দ দুই-ই হচ্ছে।

অনুরাধা : তা হলে আমি কী বলব গিয়ে?

বিদ্যাপতি : আমি তোমার কথার ইঙ্গিতে বুঝলাম অনুরাধা, যে আমার যাওয়া উচিত নয়। তুমি সর্বদা রানির কাছে থাক। তুমি হয়তো রানির ভাবান্তর লক্ষ করেছ। রাজা জীবিত নেই, রানিই এখন রাজ্যেশ্বরী, স্বাধীনা।—হুঁ তুমি বলো অনুরাধা, আমি যেতে পারব না। তোমাকে দিয়ে মিথ্যা বলাব না।

অনুরাধা : ঠাকুর, একটু পা দুটো এগিয়ে দাও দেখি। থাক থাক, তোমরা পাথরের জাত, আমিই এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করি।

[গান]

নাথ, দরশ সুখে বিধি কৈল বাদ
অঙ্কুরে ভাঙল বিধি অপরাধ।
সুখময় সাগর মরুভূমি ভেল,
জলদ নেহারি চাতক মরি গেল!

[হঠাৎ ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি]

বিজয়া : দাদা! ভীষণ বৃষ্টি নামল যে। ঘরে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। দোর জানালাগুলো বন্ধ করে দিই?

বিদ্যাপতি : না, খোলা থাক। অন্ধকারের কালোর সাথে মেঘের কালো মিলে কী অপরূপ কৃষ্ণমূর্তি ধারণ করেছে প্রকৃতি, দেখেছিস বিজয়া?

বিজয়া : তুমি দেখো দাদা, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি চললাম। [প্রস্থান]

[বিদ্যাপতির গান]

এ সখী, হমারি দুকের নাহি ওর!
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর॥

ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘনে খরশর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত পাত মোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া,
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি ফাটি যাওত ছাতিয়া॥
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিক পাঁতিয়া,
বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঁয়ায়বি হরি বিনু দিনরাতিয়া॥

দ্বাদশ খণ্ড

[দূরে লছমীর গান]

সজনী ! কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব
মঝু মনে নাহি পতিয়াই॥
এখন তখন করি দিবস গোঙায়লুঁ—
দিবস দিবস করি মাসা,
মাস মাস করি বরখ খোয়ায়লুঁ
খোয়ায়লুঁ এ তনুক আশা॥

[বিদ্যাপতির গান]

অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব কি করব বারিদ মেহে।
এ নব যৌবন বিফলে গোঙায়ঁব কি করব সো পিয়া লেহে॥

বিদ্যাপতি : কে ? রানি ?

রানি : আমি লছমী, চরণের দাসী।

বিদ্যাপতি : তুমি ? এই নিশীথ রাত্রে ঝড়-বৃষ্টির মাঝে তুমি একা এলে ?

লছমী : হ্যাঁ, একা। আর থাকতে পারলাম না বলেই তো আমার দুখের দোসরের অভিসারে বেরিয়েছি। বিদ্যাপতি। চার বছর ধরে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে আজ তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে এলাম। রাজা যেদিন আমাদের সকল প্রেমকে ম্লান করে চলে গেলেন, সেইদিন থেকেই এই এক বছর তোমায় ভুলতে চেয়েছি, তোমার প্রেম—তোমার গান—তোমার সকল কিছুকে উপেক্ষা করতে, অবহেলা করতে চেয়েছি। যত ভুলতে চেয়েছি, তুমি হয়েছ তত নিকটতম। এ কী দুর্বার আকর্ষণ তোমার ! আমি ক্ষতবিক্ষত হলাম নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে, আর পারিনে। আমার ঠাঁই দাও ওই চরণে।

বিদ্যাপতি : রানি ! তুমি কি সেই লছমী, না তার কঙ্কাল, প্রেত ? সত্যই তুমি আজ একা—তোমার প্রেম তোমায় ছেড়ে গেছে !

রানি : বিদ্যাপতি ! প্রিয়তম ! সত্যই আজ আমি নিঃসম্বল, তুমি ছাড়া ত্রিজগতে আজ আর আমার কেউ নেই। তুমি আমায় তাড়িয়ে দিয়ো না !

বিদ্যাপতি : রানির মহিমা প্রেমের মহিমাকে তুমি এমন করে পদদলিত করবে লছমী, এ আমার স্বপ্নেরও অতীত ছিল। শোনো রানি—আমি চেয়েছিলাম তোমাকেই—রাজা যদি জীবিত থাকতেন হয়তো তোমাকেই, শুধু তোমাকেই চাইতাম। কিন্তু আজ আর তোমাকে চাই না। রাজার মৃত্যু তাঁর অচিন্তনীয় ত্যাগ আমাকে সত্যকার প্রেমের পথ দেখিয়ে দিয়েছে। পাথর কুড়াতে গিয়ে আমি পেয়েছি পরশ-মানিক। তাঁর ছোঁয়ায় আমার সকল কাম হয়ে গেছে সোনা। তোমার মধ্য দিয়ে আমি পেয়েছি সত্যকার লছমী দেবীকে—নারায়ণীকে, নারায়ণকে।

রানি : নিষ্ঠুর ! তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান করছ ? তুমি তা হলে এতদিন গানে গানে সুরে সুরে আমায় প্রতারণা করেছ ? নির্মম ব্যাধের জাত তোমরা, বাঁশির সুরে ডেকে হরিণীকে বধ করাই তোমাদের ধর্ম।

বিদ্যাপতি : দেবী ! আমি তোমায় প্রতারণা করিনি। প্রত্যাখ্যানও করছিনে। তুমি যা চাও আমার সে প্রেম তো তুমি পেয়েছ।

রানি : না, পাইনি ; পেলে আমার অন্তরে এ হাহাকার থাকত না। শোনো বিদ্যাপতি, আমি চাই না শূন্য প্রেম—যাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, আমি চাই তোমাকে—তোমার প্রাণ-মন-দেহ-আত্মা—তোমার সকল কিছুকে।

বিদ্যাপতি : আমি তো বলেছি, আমার কামনা একদিন ছিল—আজ আর নেই। এই কামনাশূন্য-দেহ নিয়ে শবসাধনা করে তোমারও মুক্তি হবে না, আমারও হবে অধোগতি। তোমার এই প্রেম শ্রীকৃষ্ণে—অর্পণ করো, তুমি সুখী হবে, শান্তি পাবে। আর তা না পারলেও তোমার প্রেম যদি সত্য হয়, আমাকে ভালোবেসে তুমি শ্রীভগবানের করুণা লাভ করবে।

রানি : আমি চাই না, চাই না অন্যকিছু, চাই না মুক্তি। আমি চাই তোমাকে—স্বর্গে হোক, নরকে হোক, যেখানে হোক আমি চাই কেবল তোমাকে—বিদ্যাপতি, তোমাকে। আমি তোমাকে পেতে চাই আমার বক্ষে, আমার চক্ষে, আমার প্রতি অঙ্গ দিয়ে তোমার প্রতি অঙ্গের পরশ পেতে !

বিদ্যাপতি : লছমী ! লছমী ! ছাড়ো ! ছাড়ো ! যেতে দাও, পালিয়ে যেতে দাও আমাকে এখান থেকে।... তুমি প্রেম-অপভ্রষ্টা মায়াবিনী রূপ ধরে

আমায় শ্রীভগবানের পথ থেকে ফিরাতে এসেছ। এ কী জ্বালাময় তোমার স্পর্শ ! উঃ—আমি পালিয়ে গিয়ে এই তপস্যাই করব লছমী ; যেন তোমাকে এই নিচে থেকে উর্ধ্বে টেনে তুলতে পারি। (ছুটিয়া চলিলেন)

লছমী : বিদ্যাপতি ! বিদ্যাপতি ! নিষ্ঠুর !

ত্রয়োদশ খণ্ড

[ভীষণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বিদ্যাপতি ছুটিয়া চলিয়াছেন]

অনুরাধা : ঠাকুর ! ঠাকুর ! ও পথে নয় এই দিকে, এই দিকে—এসো !

বিদ্যাপতি : কে ? কে তুমি চলেছ, আমার আগে দীপ জ্বালিয়ে—পথ দেখিয়ে ?

অনুরাধা : (তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া) আমি বিষ্ণুমায়া !

বিদ্যাপতি : অনুরাধা ! অনুরাধা ! নিয়ে চলো, নিয়ে চলো আমায় এই ঝড়বৃষ্টি কৃষ্ণরাতের অন্ধকারের মধ্য দিয়ে। নিয়ে চলো সেইখানে, যেখানে নেই মানুষের লালা-সিক্ত কামনা-সিক্ত ভালোবাসা। যেখানে আছে অনন্ত প্রেম, অনন্ত ক্রন্দন, অনন্ত অতৃপ্তি।

অনুরাধা : এসো কবি, এসো সাধক ! এই অশান্ত কৃষ্ণ নিশীথিনীর পরপারেই পাবে অশান্ত কিশোর চিরবিরহী শ্রীকৃষ্ণকে। ওই শোনো তাঁর মধুর মুরলীধ্বনি ! (দূরে করুণ বাঁশির সুর)

বিদ্যাপতি : অনুরাধা দাঁড়াও, দাঁড়াও ! কে যেন আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। উঃ রাধা ! রাধা ! আমায় কৃষ্ণ-সর্পে দংশন করেছে। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল ! সকল দেহ আমার বিষে জ্বলে গেল।

অনুরাধা : (ছুটিয়া আসিয়া) ঠাকুর ! ঠাকুর ! দেখছ ! ওই কৃষ্ণ-সর্পের মাথায় কী অপূর্ব মণি জ্বলছে। ও কৃষ্ণ-সর্প নয় ঠাকুর ! তোমায় দংশন করেছে কৃষ্ণবিরহ। ওই বিরহিণী যাকে দংশন করে, তার মুক্তির আর বিলম্ব থাকে না। ঠাকুর ! আমার শ্রীকৃষ্ণ ! আমার গিরিধারীলাল। আমার প্রিয়তম ! (শেষ কথাকটি বলিতে বলিতে অনুরাধা নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।)

বিদ্যাপতি : অনুরাধা ! অনুরাধা ! কোথায় নিরুদ্দেশ হলে তুমি ? অনুরাধা ! বুঝেছি, বুঝেছি তুমি বিষ্ণুমায়া ! আমি মনে মনে চেয়েছিলাম গঙ্গায় ডুবে লছমীর স্পর্শ—পাপ স্খালন করতে—তাই তুমি ভুলিয়ে এনেছ গঙ্গার বিপরীত পথে—আলেয়ার আলো দেখিয়ে। বুঝেছি, তোমার মায়ায় ভুলেছিলাম আমি আমার আরাধ্যা দেবীকে। সেই পাপে আমার এই শাস্তি—এই সর্প-দংশন, এই

ভীষণ মৃত্যু।—কিন্তু আমি যাব, আবার গঙ্গার পথেই যাব। যতক্ষণ শেষ নিশ্বাস থাকবে আমার, ততক্ষণ ছুটব পতিতপাবনীকে স্মরণ করে। (ছুটিয়া চলিলেন)

রানি : অনুরাধা ! অনুরাধা ! কেন আমায় ভাগীরথীর কূলে ডেকে আনলি ? বল মায়াবিনী তোর কী ইচ্ছা ?

অনুরাধা : তোমার জন্ম-জন্মান্তরের চাওয়াকে যদি চাও লছমী, তা হলে আমার সাথে এসো। পারবে আমার সাথে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে ?

রানি : তোর ইঙ্গিত বুঝেছি অনুরাধা। এই কলুষিত চিত্ত নিয়ে আমি শরণ নিয়েছিলাম আমার মুখর দেবতার—তাই দেবতা হলেন বিমুখ ! তাই চাস এই পতিতপাবনীর জলে আমার এই পাপ-দেহের বিসর্জন। তবে তাই হোক। আমি যেন জন্মান্তরে—পরজন্মে, আমার বিদ্যাপতি—আমার নারায়ণকে আমার করে পাই। মা গো পতিতপাবনী।— (দুই জনে গঙ্গার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন)

বিদ্যাপতি : মা গো। পতিতপাবনী ভাগীরথী আমি তোর কোলের আশায় এত পথ ছুটে এলাম, তবু তোর কোলে আমার এই পাপ-তাপিত বিষ-জর্জরিত দেহ রাখতে পারলাম না মা ! অঙ্গ আমার অবশ হয়ে এলো। আর চলতে পারি না, মা ! মাকে ডেকে, মৃত্যু উপেক্ষা করে সন্তান এলো এতদূর পথ, আর তুই এতটুকু পথ আসতে পারলি না মা ! ভক্ত ছেলের ডাকে ? মা ! মা ! মা গো ! (দূরে গঙ্গার কলকল শব্দ) এ কী ! এ কী ! কোথা হতে ভেসে আসে দু-কূলপ্লাবী জোয়ারের কলকল সংগীত ? তবে কি মা সন্তানের অন্তিম প্রার্থনা শুনেছিস ! মা মকরবাহিনী, সকল কলুষনাশিনী মা গো ! এ কী শীতল স্নিগ্ধ স্পর্শ তোর মা ! আমার সকল মন-প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। কাল-কেউটের দংশনজ্বালা জুড়িয়ে গেল মা তোর মাতৃ-করস্পর্শে। কে ? কে ? তুমি মা পরমেশ্বরী ?

মা ভাগীরথী : বিদ্যাপতি ! পুত্র আমার ! আমার শাপ-ভ্রষ্ট সন্তান তুমি, আমি তোমার ডাকে তোমাকে কোলে তুলে নিতে এসেছি তোমার আপন ঘরে নন্দন-লোকে।

[লছমী ও অনুরাধা দূরে স্রোতে ভাসিয়া আসিতেছে—দূরে লছমীর গান নিকটতর হইতে লাগিল।]

সজনী, আজু শমন দিন হয়।
নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁজিল
প্রাণ দেহে নাহি রয়॥
বরষিছে পুন পুন অগ্নি-দাহন যেন
জানিনু জীবন লয়।

[বিদ্যাপতির গান]

বিদ্যাপতি কহে শুন শুন লছমী, মরণ মিলন মধুময়॥

লছমী : কে? বিদ্যাপতি?

বিদ্যাপতি : লছমী? তুমি?

অনুরাধা : হ্যাঁ ঠাকুর! নিয়ে এসেছি আমি তোমার জীবন-মরণের সাথি লছমীকে। পবিত্র সুরধুনী-ধারায় স্নাত হয়ে তোমরা উভয়ে হয়েছ নির্মল। তাই মায়ের কোলে, মরণকে পুরোহিত করে হলো তোমাদের মিলন। (বলিতে বলিতে অনুরাধা দূরে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।)

লছমী : অনুরাধা! সখী! আর তুই কি আমাদের ছেড়ে এমনি দূরে ভেসে যাবি?

অনুরাধা : লছমী! সখী! আমি যেন জন্ম-জন্ম কালস্রোতে ভেসে এমনই যুগলমিলন দেখে মরতে পারি। (ভাসিয়া যাইতে যাইতে অনুরাধার কণ্ঠে গান ভাসিয়া আসিল—)

তোমার যাহাতে সুখ
তাহে আমার সুখ
সুন্দর মাধব হমার।
কোটি জনম যেন তুহার সুখের লাগি
ডারি দেই এ জীবন ছার॥

[ভীষণ স্রোত আসিয়া সকলকে ডুবাইয়া দিল।]

[যবনিকা পতন]

বিদ্যাপতি

(রেকর্ড-নাটিকা)

প্রথম খণ্ড

[মিথিলার কমলা নদীর তীরে গ্রাম। তাহারই উদ্যানবাটিকা দেবীদুর্গা মন্দির। কবি বিদ্যাপতি দুর্গাস্তব গাহিতেছেন।]

(স্তব)

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে
নমস্তে জগদবন্দ্য পদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥

অনুরাধা : ঠাকুর ! ঠাকুর !

বিদ্যাপতি : (মন্দির-অভ্যন্তর হইতে) কে ?

অনুরাধা : আমি অনুরাধা, একটু বাইরে বেরিয়ে আসবে ?

বিদ্যাপতি : (মন্দির-দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। বিরক্তির সুরে) একটু অপেক্ষা করলেই পারতে, অনুরাধা। এত বড়ো ভক্তিমতী হয়ে তুমি মায়ের নামগানে বাধা দিলে ?

অনুরাধা : আমায় ক্ষমা করো ঠাকুর। অত্যন্ত প্রয়োজনে আমি তোমার ধ্যান ভঙ্গ করেছি। আমার কৃষ্ণগোপালের জন্য আজ কোথাও ফুল পেলাম না। তোমার বাগানে অনেক ফুল, আমার গিরিধারীলালের জন্য কিছু ফুল নেব ? আমার গোপালের এখনও পূজা হয়নি।

বিদ্যাপতি : তুমি তো জান অনুরাধা, এ বাগানে ফুল ফোটে শুধু আমার মায়ের পায়ে অঞ্জলি দেওয়ার জন্য। এ ফুল তো অন্য দেব-দেবীকে দিতে পারিনে !

(মন্দির দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন, মন্দির-অভ্যন্তরে স্তব পাঠের মৃদু গুঞ্জন শোনা গেল।)

বিদ্যাপতি : (গুনগুন স্বরে)

মা ! আমার মনে আমার বনে
ফোটে যত কুসুমদল

সে ফুল মাগে তোরই তরে
পূজতে তোরই চরণতল॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ—

অনুরাধা : (অশ্রুসিক্ত) ঠাকুর ! ঠাকুর ! চলে গেলে। তুমি কি সত্যিই এত নিষ্ঠুর? তবে কি আমার ঠাকুরের পূজা হবে না আজ? আমার কৃষ্ণগোপাল ! আমার প্রিয়তম ! তুমি যদি সত্য হও, আর আমার প্রেম যদি সত্য হয়, তা হলে আজ এই বাগানের একটি ফুলও অন্য কারুর পূজায় লাগবে না। এই বাগানের সকল ফুল তোমার চরণে নিবেদন করে গেলাম। (প্রস্থান)

দেবীদুর্গা : ক্ষান্ত হও বিদ্যাপতি ! ও ফুল শ্রীকৃষ্ণ চরণে নিবেদিত। বিষ্ণু-আরাধিকা যে ফুল শ্রীহরির চরণে নিবেদন করে গেছে, সে ফুল নেবার অধিকার আমার নেই।

বিদ্যাপতি : মা ! মা !

দেবীদুর্গা : শোনো পুত্র, তুমি হয়তো জান না যে আমি পরমা বৈষ্ণবী, জগৎকে বিষ্ণুভক্তি দান করি আমিই।

বিদ্যাপতি : তোর ইঙ্গিত বুঝেছি, মহামায়া। তবে তোরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক ইচ্ছাময়ী ; আমি আজ থেকে বিষ্ণুরই আরাধনা করব।

[বিদ্যাপতির গীত]

আমার শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে জপবো আমি শ্যামের নাম॥
মা হলো মোর মন্ত্রগুরু, ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম॥

বিজয়া : দাদা ! দাদা ! শিগরির এসো। মা আমাদের ছেড়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

বিদ্যাপতি : অ্যা ! বিজয়া ! বিজয়া ! মা নেই, মা চলে গেলেন?

দ্বিতীয় খণ্ড

[মিথিলার রাজা শিবসিংহের উদ্যানবাটিকা]

বিদ্যাপতি : মিথিলার রাজা শিবসিংহের জয় হোক !

শিবসিংহ : স্বাগত বিদ্যাপতি ! বন্ধু ! তোমার মাতৃশোক ভুলবার যথেষ্ট অবসর না দিয়ে স্বার্থপরের মতো রাজধানীতে ডেকে এনেছি। আমার অপরাধ নিয়ো না সখা।

বিদ্যাপতি : মহারাজ ! আমি আপনার দাসানুদাস। শুধু আমি কেন, আমরা পুরুষানুক্রমে মিথিলার রাজ-অনুগ্রহে ও আশ্রয়ের স্নিগ্ধ শীতল

ছায়ায় লালিত-পালিত। আপনার আদেশ আমার সকল দুঃখের ঊর্ধ্বে, মহারাজ!

রাজা : তুমি জানো সখা, রাজসভার বাইরে তুমি ওভাবে কথা বললে আমি কত বেদনা পাই। আমরা সহপাঠী বন্ধু, তোমরা তো রাজ-অনুগৃহীত নও, বন্ধু, মিথিলার রাজারাই তোমাদের কাছে ঋণী, অনুগৃহীত। তোমরা পুরুষানুক্রমে প্রধানমন্ত্রী হয়ে মিথিলার রাজা ও রাজ্যকে নিয়ন্ত্রিত করেছ।

রানি লছমী : তুমি তো শুধু রাজমন্ত্রীই নও বিদ্যাপতি। তুমি রাজকবি। মিথিলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি!

বিদ্যাপতি : মহারানি এখানে আছেন তা তো বলো নাই, সখা।

রাজা : রানি লছমী দেবীর অনুরোধেই তোমায় এত তাড়া দিয়ে এনেছি, বন্ধু! তোমার কণ্ঠের গান না শুনলে নাকি ওঁর সে দিনটাই নাকি হয় বৃথা। এত শ্রদ্ধা তোমার ওপর, তবু মাঝের ওই পর্দাটুকু আর উঠল না। এ নিরর্থক লজ্জার আবরণ আমাকেই লজ্জা দেয় বেশি। আর কথা নয় কবি, এবার আলাপন হোক শুধু গানে গানে।

বিদ্যাপতি : মহারানির আদেশ শিরোধার্য। কোন গান গাইব, দেবী?

রানি : আমার সেই প্রিয় গান 'জনম জনম হাম রূপ নেহারলুঁ ও গানটা আমার কাছে কখনও পুরানো হলো না।

[বিদ্যাপতির গীত]

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ নয়ন ন তিরপিত ভেল!
লাখ লাখ যুগ হিয় হিয় রাখলুঁ, তবু হিয় জুড়ন ন গেল!
দেখি সাধ না ফুরায় গো!
রূপ যত দেখি তত কাঁদি সাধ না ফুরায় গো
হিয়া কেন না জুড়ায় গো, হিয়ার উপরে গিয়া
হিয়া তবু না জুড়ায় গো।

তৃতীয় খণ্ড

[অনুরাধার গীত]

সখী লো!
অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল-মানিক কো হরি লেল॥
হরি হরিয়া নিল কে?

লছমী : রাজা ! কে যায় পথে অমন করুণ সুরে গান গেয়ে ? ওকে এখানে ডাক না !

বিদ্যাপতি : মহারানি ! আমি ওকে জানি। আমি যেখানে যাই, ও আপনি এসে হয় আমার প্রতিবেশিনী। ওর নাম অনুরাধা। গিরিধারীলাল শ্রীকৃষ্ণ ওর জপমালা।

লছমী : তাহলে তুমি ওকে ডেকে আনো না, কবি !

বিদ্যাপতি : আমি যাচ্ছি দেবী কিন্তু জানি না ও আসবে কি না।

[অনুরাধার গীত]

নয়নক নিন্দ গেও বয়ানক হাস,
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হম পাশ,
পাপ পরান মম আন নাহি জানত
কানু কানু করি ঝুরে।

লছমী : অনুরাধা, কী মিষ্টি নাম তোমার ! তুমি আমার কাছে থাকবে ? বিদ্যাপতি ! তুমি যদি অনুমতি দাও তা হলে অনুরাধাকে আমার কাছে রেখে শ্যামনাম শুনি !

বিদ্যাপতি : আমি তো ওর অভিভাবক নই, দেবী। ও আমার ছোটো বোন বিজয়ার বন্ধু।

লছমী : ওর বাবা মা কোথায় থাকেন ?

বিদ্যাপতি : গতবার দেশে যখন মড়ক লাগে তখন ওর বাবা মা দু-জনেই মারা যান।

লছমী : ওর বিয়ে হয়নি ?

বিদ্যাপতি : না। (হাসিয়া) ও বলে ও বিয়ে করবে না।

অনুরাধা : বা রে, আমি বুঝি তোমার গলা ধরে বলতে গেছিলুম যে আমি বিয়ে করব না। না মহারানি, ঠাকুর জানেন না। আমার বিয়ে হয়েছে।

বিদ্যাপতি : তোমার বিয়ে হয়েছে ? কার সাথে ?

অনুরাধা : সে তুমি জানো না, বিজয়া জানে।

লছমী : আমিও হয়তো জানি ! তুমি থাকবে ভাই আমার কাছে ? আমার সখী হয়ে, আমার বোন হয়ে ? আর বদলে আমি তোমার বরকে ধরে এনে দেব।

অনুরাধা : তা কি প্রাণ ধরে দিতে পারবে রানি ? যে ঠাকুর আমার সে যে তোমারও।

বিদ্যাপতি : মহারাজ ! ওদের নিভৃত আলাপনের কমল বনে আমাদের উপস্থিতি মত্ত মাতঙ্গের মতোই ভীতিজনক। আমরা একটু অন্তরালে গেলেই বোধ হয় সুশোভন হতো।

রাজা : চলো বিদ্যাপতি, তোমার ইঙ্গিতই সমীচীন।
লছমী : আর একটি গান গাও না ভাই।

[অনুরাধার গীত]

সজল নয়ন করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।
(যেন শত যুগ মনে হয়
তারে এক তিল না হেরিলে শত যুগ মনে হয়)
বিধি বড়ো দারুণ তাহে পুন ঐছন
দরহি করলুঁ মুরারি।

রাজা : কবি ! এইখানে—এই খানে এসো। এই ঝোপের অন্তরাল থেকে ওদের দুই দেবীকে দিব্যচক্ষে দর্শন করা যাবে।
বিদ্যাপতি : মহারাজ ! যে নিজে থাকতে চায় গোপন তাকে জোর করে প্রকাশ করার বর্বরতা আমার নেই।
রাজা : আঃ ! কবি হয়ে তুমি কি করে এমন বেরসিক হলে বলো তো? ওই দেবীর দল যখন চিকের আড়াল থেকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাদের দেখতে থাকেন, তাতে কোনো অপরাধ হয় না, আর আমরা একটু আড়াল আবডাল থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

চতুর্থ খণ্ড

লছমী : অনুরাধা ! তোমার কবিকে দিয়ো আমার এই কণ্ঠহার !
অনুরাধা : বেশ ! তা হলে আজ আমি আসি, রানি !
লছমী : রানি নয়, রানি নয়, অনুরাধা লছমী। তুমি আমায় লছমী বলে ডেকো। রানির কারাগারে আমার ডাক-নামের হয়েছিল মৃত্যু। তোমার বরে সে নাম আমার বেঁচে উঠুক।
অনুরাধা : লছমী ! লছমী ! তুমি সত্যিই লছমী। রূপে লছমী, গুণে লছমী, গোলোকের অধীশ্বরী লক্ষ্মী।
লছমী : আর তুমি? তুমি বুঝি ব্রজের দূতী?
অনুরাধা : হ্যাঁগো তোমার দূতিয়ালিই করব, এই চাকরিই আমি নিলাম, সখী ! তোমার কণ্ঠহার আমি যথাস্থানে দেব তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

[অনুরাধার গীত]

ধন্য ধন্য ধন্য রমণী জনম তোর।

সব জন কানু কানু করে ঝুরে
সে কানু তোর ভাবে বিভোর।

[উদ্যান-অন্তরালে বিদ্যাপতি ও শিবসিংহ]

রাজা : বিদ্যাপতি ! বিদ্যাপতি ! দেখেছ ? ওদের দু-জনের মুখে গোধূলির আলো পড়ে ঠিক বিয়ের কনের মতো সুন্দর দেখাচ্ছে। বিদ্যাপতি ! বিদ্যাপতি ! আরে ? তুমি যে নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে গেলে ! বিদ্যাপতি !

[বিদ্যাপতির গীত]

অপরূপ পেখলুঁ বামা।
কনকলতা অবলম্বনে উঠল
হরিণীহীন হিমধামা॥
(একী অপরূপ রূপ-ফাঁদ)
(স্বর্ণলতিকা ধরি উঠিয়াছে যেন ওই কলঙ্কহীন এ চাঁদ)
নলিন নয়ান দুটি অঞ্জনে রঞ্জিত
এ কী ভুরু ভঙ্গি-বিলাস
চকিত চকোর জোড় বিধি যেন বাঁধিল
দিয়া কালো কাজরপাশ।
গুরু গিরিবর পয়োধর পরশিছে
গ্রীবার গজমোতি হারা,
কাম কম্বু ভরি কনক-কুম্ভ পরি
ঢালে যেন সুরধুনী-ধারা।

পঞ্চম খণ্ড

[বিদ্যাপতি-ভবন]

বিদ্যাপতি : বিজয়া !

বিজয়া : দাদা ! ডাকচ ?

বিদ্যাপতি : হ্যাঁ, অনুরাধা কোথায় রে ?

বিজয়া : কী জানি। সে কি বাড়ি থাকে ? সকাল হতে না হতে রানির যানবাহন এসে ওকে নিয়ে যায়। ও মাঝে মাঝে পালিয়ে আসে আমার কাছে, আর অমনি সাথে সাথে আসে রানির চেড়িদল। রানির অনুগ্রহ ওকে গ্রহের মতো গ্রাস করেছে। আবার রাজার নাকি হুকুম হয়েছে এখন থেকে রাত্রেও তাঁর কাছে থাকতে হবে। এ কিন্তু

রানির অত্যাচার দাদা। হয় তুমি এর প্রতিকার করো, নইলে আমিই রাজার কাছে আবেদন করব।

বিদ্যাপতি : হুঁ! হ্যাঁরে বিজয়া, সেদিন অনুরাধা বলছিল, ওর বিয়ে হয়ে গেছে! সত্যিই কি ওর বিয়ে হয়েছিল?

বিজয়া : (সক্রোধে) আমি জানি না। আচ্ছা দাদা, তুমি কবি, সাধক। তুমি তো মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পাও। অনুরাধার দিকে কখনও চোখ ফিরিয়ে দেখেছ কি?

বিদ্যাপতি : তা দেখিনি! কিন্তু ভুল তো তুইও করে থাকতে পারিস, বিজয়া। ওর স্বামী যদি কেউ থাকেনই, সে এ পৃথিবীর মানুষ নয়, ওর স্বামী গিরিধারীলাল শ্রীকৃষ্ণ।

বিজয়া : হ্যাঁগো হ্যাঁ, ওই নামের ছল করে ও যাকে পূজা করে আমি তাকে জানি। তুমি ইচ্ছা-অন্ধ, তাই দেখতে পাও না।

[অনুরাধার গীত]

সখী লো মন্দ প্রেম পরিণামা।

বিজয়া : ওই যে হতভাগিনী আসছে।

বিদ্যাপতি : তুই ওকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দে তো!

বিজয়া : দিচ্ছি দাদা!

বিদ্যাপতি : আমায় এ কী পরীক্ষায় ফেললে ঠাকুর!

অনুরাধা : আমায় ডাকছিলে ঠাকুর!

বিদ্যাপতি : হ্যাঁ রাধা! রানি কি তোমায় রাত্রেও তাঁর কাছে থাকতে আদেশ করেছেন?

অনুরাধা : হ্যাঁ, রানি বলেন দূতীর দূতিয়ালির প্রয়োজন রাত্রেই বেশি। তবে এ তাঁর আদেশ নয়, আবদার।

বিদ্যাপতি : দূতী! কীসের দূতিয়ালি রাধা?

অনুরাধা : ঠাকুর! তুমি আমায় কী মনে কর! পাগল, নির্বোধ বা ওইরকম একটা কিছু, না? তুমি যে এত যত্ন করে রোজ তোমার নব-রচিত গানগুলি শেখাও, তুমি কি মনে কর আমি তার মানে বুঝিনে? আর আমি কি শুধু রানিরই দূতিয়ালি করি? আমি কি লেখার গানেরও দূতিয়ালি করিনে?

বিদ্যাপতি : আমি তোমার কাছে আর আত্মগোপন করব না, রাধা। সত্যই তোমার সুরের সেতু বেয়ে হয় আমাদের মিলন! তবে, তুমি তো জান আমার এ প্রেম নিষ্কলুষ, নিষ্কাম। তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

অনুরাধা : বলো।

বিদ্যাপতি : তুমি কি সত্যিই আমায় ভালোবাস?
অনুরাধা : না।
বিদ্যাপতি : তুমি আমায় বাঁচালে, অনুরাধা।
অনুরাধা : তোমায় আমি ভালোবাসিনে। কিন্তু আমি ভালোবাসি তাকে যাকে তুমি ভালোবাস। ঠাকুর! ঠাকুর! আমাকে এই বর দাও যেন জন্মে জন্মে তোমার ভালোবাসার জনকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারি; তুমি যাকে ভালোবেসে সুখ পাও, তারই দাসী হতে পারি। আর দিনান্তে একবার শুধু ওই চরণ বন্দনা করতে পারি।

ষষ্ঠ খণ্ড

[রাজগৃহ]

রাজা : আমার মুখের দিকে অমন হাঁ করে চেয়ে কি দেখছ ধনঞ্জয়?
ধনঞ্জয় : ভয় নেই মহারাজ! ভয় নেই! আপনিও মেঘ নন, আর আমিও চাতক পক্ষী নই। মহারাজ যদি অভয় দেন, তা হলেই একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।
রাজা : বলো কী বলতে চাও।
ধনঞ্জয় : আমি বলছিলাম, মহারাজ, বৃন্দাবনের আয়ান ঘোষের সঙ্গে কি আপনার কোনো কুটুম্বিতা ছিল?
রাজা : তার মানে?
ধনঞ্জয় : তার মানে আর কিছু নয় মহারাজ, চেহারা তো দেখিনি, তবে তার বুদ্ধির সঙ্গে আপনার বুদ্ধির অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে।
রাজা : ধনঞ্জয়!
ধনঞ্জয় : দোহাই মহারাজ! আমার মাথা কাটা যাক তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আপনার অ-রসিক বলে বদনাম রটলে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে!
রাজা : বটে! আচ্ছা বলো কী বলছিলে!
ধনঞ্জয় : আমি বলছিলাম মহারাজ, আপনার ওই প্রধানমন্ত্রী বিদ্যাপতির কথা। ছিলেন দুর্গা-উপাসক, ঘোর শাক্ত, হলেন পরম বৈষ্ণব, কৃষ্ণভক্ত। ছিলেন রাজমন্ত্রী, কঠোর রাজনীতিক, হলেন কবি কান্ত-কোমল প্রেমিক।
রাজা : তাতে তোমার কি ক্ষতি বৃদ্ধি হলো ধনঞ্জয়?
ধনঞ্জয় : কিছু না মহারাজ! ক্ষতি বৃদ্ধি যা হবার তা হচ্ছে রাজার আর তাঁর রাজ্যের। এ ক্ষতিও হচ্ছিল এতদিন গোপনে, তাকেও আবার দিনের আলোয় টেনে আনলে বিন্দে দূতী!

রাজা : বিন্দে দূতী? সে আবার কে?

ধনঞ্জয় : আজ্ঞে ওই হলো! আপনারা যাকে বলেন অনুরাধা, আমাদের মতো দুর্জন, তাকেই বলে বিন্দে দূতী।

রাজা : অর্থাৎ সহজ ভাষায় তোমার কথার অর্থ এই যে, কবি বিদ্যাপতি হচ্ছেন নন্দলাল, আমি হচ্ছি আয়ান ঘোষ আর শ্রীমতী হচ্ছেন—!

ধনঞ্জয় : দোহাই মহারাজ! মাথা আর ঘাড়ের সন্ধিস্থলে বিচ্ছেদের ভয় যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ও পাপ কথা কোন সাহসে উচ্চারণ করি মহারাজ!

রাজা : ধনঞ্জয়, আয়ান ঘোষের গোপবুদ্ধি আর তোমাদের রাজার ক্ষাত্রবুদ্ধিতে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। তোমরা কী বোঝ জানি না, আমি কিন্তু সব শুনি, সব দেখি, সবই বুঝি।

ধনঞ্জয় : মহারাজ পরম উদার। আপনার ধনবল জলবলও অপরিমাণ; তবু মহারাজ, জটিলা কুটিলার মুখ বন্ধ করতে তা কি যথেষ্ট?

রাজা : দেখো ধনঞ্জয়, চোর যতক্ষণ ঘরের আশে পাশে ঘোরে ততক্ষণ জাগ্রত বলবান গৃহস্থ তাকে ভয় করে না। হ্যাঁ, তবে তাকে লক্ষ রাখতে হয় যে ঘরে সিঁধ না কাটে! যাক তুমি কি আর কিছু লক্ষ করেছ?

ধনঞ্জয় : আজ্ঞে তা মিথ্যে বলতে পারব না। মহারানি প্রত্যহ রাজসভায় এসে চিকের আড়াল টেনে বসেন হয়তো রাজকার্য দেখতেই এবং সে চিক গলিয়ে একটা চামচিকেরও যাবার উপায় নেই। তবু বিদ্যাপতির ওই পর্দামুখী আসনটা অনেকেরই চক্ষুশূল স্বরূপ হয়ে উঠেছে।

রাজা : ধনঞ্জয়, আমি লক্ষ রেখেছি বলেই ওদের মাঝের পর্দাটুকু আজও অপসারিত হয় নি। তোমরা নিশ্চিন্ত থেকো আর তোমাদের সকলকে জানিয়ে দিয়ো যে, ওদের চেয়ে আমার দৃষ্টির পরিসর অনেক বেশি। ওরা দেখে শুধু রাজসভা আর রাজ-অন্তঃপুর, আর আমাকে দেখতে হয় সমগ্র রাজ্য।

ধনঞ্জয় : আচ্ছা মহারাজ! তারই পরীক্ষা হোক।

রাজা : কী পরীক্ষা করতে বলো তুমি?

ধনঞ্জয় : আমি বলি কী কোনোরকমে দিন কতকের জন্য রানিকে আটকে রাখুন। তিনি যেন রাজসভায় না আসেন। তারপর রানির অবর্তমানে বিদ্যাপতিকে কিছু নতুন পদ রচনা করে গাইতে বলুন। মহারাজ আপনার অনুগ্রহে প্রধানমন্ত্রী হয়ে উঠেছেন প্রধান গায়ক আর রাজসভা হয়ে দাঁড়িয়েছে বাবাজির আখড়া। মহারাজ, দাসের অপরাধ নেবেন না।

রাজা : তোমার ইঙ্গিত বুঝেছি। আচ্ছা ধনঞ্জয়, তাই হবে।

ধনঞ্জয় : যাবার বেলায় একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই, মহারাজ! একদা শ্যাম বনে গিয়ে শ্যামা রূপ ধারণ করে আয়ান ঘোষের চোখে ধুলো দিয়েছিলেন।

রাজা : আমার চোখের পর্দা আছে ধনঞ্জয়, এ চোখে কেউ ধুলো দিতে পারবে না।

সপ্তম খণ্ড

[বিদ্যাপতির গৃহের পুষ্পোদ্যান]

অনুরাধা : ঠাকুর আজ দু-দিন থেকে তোমার মুখে হাসি নাই, চোখে দীপ্তি নাই, কণ্ঠে গান নেই। কী হয়েছে তোমার?

বিদ্যাপতি : কেন তুমি ছলনা করছ, অনুরাধা? তুমি তো সবই জান। আজ দু-দিন ধরে রাজসভায় আমার লাঞ্ছনার আর সীমা নেই। এই দু-দিন রাজাকে একটি নূতন পদও শুনাতে পারি নি। আর তাই নিয়ে শত্রুপক্ষ আমায় বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করেছে।

অনুরাধা : হা হরি! এই দু-দিনে একটা গানও লিখতে পারলে না তোমার সুরের ঝরনা হঠাৎ এমন শুকিয়ে গেল কেন?

বিদ্যাপতি : তুমি তো জানো রাধা, আমার কাব্যের প্রেরণা, সুরের প্রাণ সবই লছমী দেবী। যেদিন তাঁর উপস্থিতি অনুভব না করি সেদিন আমার দুর্দিন। সেদিন আমার কাব্যলোকে সুরলোকে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ।

অনুরাধা : আচ্ছা ঠাকুর, তুমি তো রানিকে একটুও দেখতে পাও না, তবু কী করে বুঝতে পার যে রানি রাজসভায় এসেছেন? রানি কি কোনো ইঙ্গিত করেন?

বিদ্যাপতি : না না অনুরাধা! লছমী তো ইঙ্গিতময়ী রূপে কোনোদিন দেখা দেন নি আমায়, তিনি আমার অন্তরে আবির্ভূতা হন সংগীতময়ী রূপে। তাঁর আবির্ভাব অনুভব করি আমি আমার অন্তর দিয়ে। যেদিন রানি রাজসভায় আসেন, সেদিন অকারণ পুলকে আমার সকল দেহ-মন বীণার মতো বেজে ওঠে। শত গানের শতদল ফুটে ওঠে আমার প্রাণে। আমি তখন আবিষ্টের মতো গান করি। সে আমার আত্মার গান—ও গান পরমাত্মারূপী শ্রীকৃষ্ণের গান।

অনুরাধা : ঠাকুর আমার প্রণাম নাও। তোমার পা ছুঁয়ে আমি ধন্য হলাম। আমি কাল ভোরেই তোমাকে দেখাব তোমার কবিতা-লক্ষ্মীকে।

বিদ্যাপতি : পারবে? পারবে তুমি, অনুরাধা?

অনুরাধা : উতলা হোয়ো না ঠাকুর ! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আমি দূতী আমার অসাধ্য কিছু নেই।

বিদ্যাপতি : অনুরাধা ! তুমি হয়তো মনে করছ, আমি কী ঘোর স্বার্থপর, পাষণ্ড না ?

অনুরাধা : নিশ্চয়ই। পাষাণ না হলে ঠাকুর হবে কী করে ? শুধু নেবে দিতে জানবে না, মাথা খুঁড়ে মরলেও থাকবে অটল, তবে তো হবে দেবতা ! তবেই না পাবে পূজা !

বিদ্যাপতি : অনুরাধা ! আমি যদি তোমার প্রেমের এক বিন্দুও পেতাম তা হলে আজ আমি জগতের শ্রেষ্ঠ কবি হতে পারতাম।

অনুরাধা : না ঠাকুর, তা হলে তুমি হতে আমার মতোই উন্মাদ। সকলের আকাঙ্ক্ষা সমান নয় ঠাকুর, কেউ বা পেয়ে হয় খুশি আর কেউ বা খুশি হয় না-পেয়ে।

বিদ্যাপতি : তোমার প্রেমই প্রেম অনুরাধা, যা পায়ে শৃঙ্খলের মতো জড়িয়ে থাকে না, সে প্রেম দেয় অনন্তলোকে অনন্ত মুক্তি।

অনুরাধা : অত শত ঘোর প্যাঁচের কথা বুঝিনে, ঠাকুর। আমি ভালোবেসে কাঁদতে চাই, তাই কাঁদি। বুকে পেলে কান্না যাবে ফুরিয়ে, প্রেম যাবে শুকিয়ে, তাই পেতে চাইনে। বুকের ধনকে বিলিয়ে দিই অন্যকে। আমি চললাম ঠাকুর ! আমি চললাম। আমি কাল সকালে তোমার কবিতা-লক্ষ্মীকে দেখাব !

অষ্টম খণ্ড

(রাজ-অন্তঃপুর)

[অনুরাধার গান]

এ ধনি কর অবধান,
তোমা বিনা উনমত কান।
(কানু পাগল হলো গো। তোমারে না হেরি কানু পাগল হলো গো)

লছমী : কানু পাগল হলো না তুই পাগল হলি রাধা ?

[অনুরাধার গীত]

শুন শুন গুণবতী রাধে,
মাধবে বধিয়া তুই কী সাধিবি সাধে ?
(তুই কোন সাধ সাধিবি ? মাধবে বধিয়া তুই কোন সাধ সাধিবি ?)

লছমী : সতিনকে কাঁদাব ! বুঝলি ?

[অনুরাধার গীত]

এতহুঁ নিবেদন করি তোরে সুন্দরি
জানি ইহা করহ বিধান।
হৃদয়-পুতলি তুহুঁ সে শূন্য কলেবর
তুহুঁ বিদ্যাপতি-প্রাণ॥

লছমী : আ—মল ! বিদ্যাপতি, বিদ্যাপতি বলে ছুঁড়ি যে নিজেই পাগল হলি ! বিদ্যাপতির বিদ্যাটুকু বাদ দিয়ে তার ঘর জুড়ে বসলেই তো পারিস।

অনুরাধা : তা হলে তোমার কী দশা হবে সখী ?

লছমী : এক কৃষ্ণকে নিয়ে ষোলো হাজার গোপিনী যদি সুখী হতে পারে, আমরা দু-জন আর সুখী হতে পারব না কেন ?

অনুরাধা : সেই প্রেমময়ী গোপিনীদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি ভাই ! আমরা তাঁদের পায়ের ধুলো হবারও যোগ্য নই।

লছমী : সে কথা যাক। অনুরাধা, আমার একটা কথা জানতে বড়ো সাধ হয়। তিনি কি একবারও তোকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন না ?

অনুরাধা : আধবারও না।

লছমী : না ভাই লক্ষ্মীটি, লুকোসনে। মহারাজার আদেশে আমি আজ দু-দিন রাজসভায় যেতে পাইনি। তাঁকে একবারও দেখতে পাইনি, তাঁর গান শুনি নি। মনে হচ্ছে, যেন কত জন্ম তাঁকে দেখি নি।

অনুরাধা : আচ্ছা ভাই, তুই যদি আজ ভোরে ঠিক এইখানে এই মাধবীকুঞ্জে তাঁকে দেখতে পাস, তা হলে কী করিস ?

লছমী : আমি গিয়ে তাঁর বামে দাঁড়াই, আর তুই মিলনের পালা গান গাস।

রাজা : রানি !

অনুরাধা : আসি আসি, সখী, মহারাজ আসছেন।

রাজা : যোয়ো না যোয়ো না, অনুরাধা।

লছমী : রাজা, তোমায় এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন ? তোমার চোখে মুখে যেন রক্ত নেই।

রাজা : ঠিক মৃতের মতো না, রানি ? না, ওটা তোমার চোখের ভুল। রানি আমার একটা কথা রাখবে ?

লছমী : বলো ?

রাজা : আমাকে কাল ভোরেই চলে যেতে হবে, চলে যেতে হবে দূরে বহু দূরে আমার রাজ্যের সীমান্ত পেরিয়ে। রানি আমি যখন থাকব না, তখন যেন আমার প্রিয় সখা বিদ্যাপতির কোনো অযত্ন না হয়।

লছমী : আমি বুঝতে পারছি রাজা, তুমি অসুস্থ। তুমি একটু চুপ করে শোও, তোমার সেবা করার কর্তব্য থেকে আমায় বঞ্চিত কোরো না।

রাজা : কর্তব্য ! সেবা ! বেশ তাই করো রানি ! তাই করো ! লোকে যা চায়, ভগবান তাকে তার সব কিছু দেন না। এই বঞ্চিত করেই তিনি টেনে নেন সেই হতভাগ্যকে তাঁর শান্তিময় কোলে। রানি যাকে ভালোবাসার কেউ নেই সে যদি ভগবানেরও চরণে আশ্রয় না পায়, তার মতো দুর্ভাগা বুঝি আর কেউ নেই।

[বিদ্যাপতির গীত]

আজু রজনি হাম ভাগে পোহায়লুঁ

মহারাজ ! আজ আমি গান শোনাতে এসেছি। আজ আমার গানের বাঁধ, প্রাণের বাঁধ, সুরের বাঁধ ভেঙে গেছে।

রাজা : এসো এসো বন্ধু, এসো বিদ্যাপতি !

নবম খণ্ড

[রাজ-উদ্যান]

রাজা : এত আনন্দ তোমার কোনোদিন দেখিনি বিদ্যাপতি ! আজ তিন দিন ধরে তুমি ছিলে বাণীহীন মূক। হঠাৎ আজ ভোরে হয়ে উঠলে আনন্দিত-কণ্ঠ, সংগীত-মুখর। তোমার এত কবি-প্রেরণা এলো কোথা থেকে, বন্ধু !

বিদ্যাপতি : তা জানি না মহারাজ। আমার প্রাণ শুনাতে চায় গান। নিখিল জগৎকে আজ সে গানে গানে পাগল করে দিতে চায়, ডুবিয়ে দিতে চায়। ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। আজ আর তোমার আদেশের অপেক্ষা রাখব না রাজা, আজ গান গাইব স্বেচ্ছায়।

[বিদ্যাপতির গীত]

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ—
পেখলুঁ পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশি ভেল নিরদ্বন্দা।
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিধি মোহে অনুকূল হোয়ল
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥

রাজা : অপূর্ব ! সাধু, কবি, সাধু ! তুমি শুধু রানির কণ্ঠহার পেয়েছিলে, আজ তোমায় রাজার কণ্ঠহার দিয়ে ধন্য হলাম। লজ্জিত হোয়ো না কবি, লজ্জিত হোয়ো না বন্ধু, তোমার বুকের তলে লুকানো থাকে রানির দেওয়া কণ্ঠহার, সে কথা আর কেউ না জানলেও আমি জানি। এই রাজ-উদ্যানে এত ভোরে তুমি আমি ছাড়া আর কেউ নেই বন্ধু ! আর অন্তরালে যদি কেউ থাকে তিনি তোমার অনাত্মীয়া নন। বিদ্যাপতি, অন্তরিক্ষের দেবী চোখের সুম্মুখে এসে আবির্ভূতা না হলে মানুষের কণ্ঠে এমন গান আসে না। দেবীর দয়া, বন্ধু, এ দেবীর দয়া !

বিদ্যাপতি : মহারাজ ! কি আমায় বিদ্রূপ করছেন ? তা করুন তবু আমার আজকের আনন্দকে মলিন করতে পারবেন না। এ আনন্দ এই শুভ প্রভাতের মতোই অমলিন।

রাজা : তা জানি বলেই তোমায় শ্রদ্ধা করে আজও বন্ধু বলেই সম্ভাষণ করি, বিদ্যাপতি ! শোনো বন্ধু আজ থেকে আমার রাজ্যে তুমি পরিচিত হবে 'কবি-কণ্ঠহার' নামে।

ধনঞ্জয় : মহারাজ, আজকের এই আনন্দটা কি সত্যিকার ?

দশম খণ্ড

বিদ্যাপতি : তুমি তা বুঝবে না ধনঞ্জয়। যে প্রদীপ তিলে তিলে পুড়ে বুকের সমস্ত স্নেহরসকে জ্বালিয়ে অপরকে দান করে আলো, সেই প্রদীপ ধনঞ্জয়, মাত্র সেই প্রদীপই জানে এই আত্মদানের, আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেওয়ার, কী অপার আনন্দ !

রাজা : ঠিক বলেছ কবি। আরতির প্রদীপ নিববার আগে যেমন করে শেষবার তার উজ্জ্বলতম শিখা মেলে দেবতার মুখ দেখে নিতে চায়, তেমনি করে আমার অন্তর-দেবতা শ্রীকৃষ্ণের মুখ দেখে নিতে চাইছে আমার শ্রান্ত প্রাণশিখা। তুমি এমন গান শুনাতে পার কবি, যা আমার অন্তিম সময়ে শুনতে ইচ্ছা করবে ?

ধনঞ্জয় : মহারাজ এইবার কিন্তু অরসিকের মতো কথা আরম্ভ হলো এবং কাজেই আমাকে সরে পড়তে হলো। (প্রস্থান)

রাজা : ধনঞ্জয় ! ধনঞ্জয় ! চলে গেছে ? আঃ বাঁচলাম ! বিদ্যাপতি, আমায় একটু ধরো, এখানে উঠে এলাম কী করে জানি না ; আর বোধ হয় এখানে থেকে উঠে যেতেও পারব না !

বিদ্যাপতি : তুমি এমন করছ কেন সখা ? তোমার কি কোনো অসুখ করেছে ?

রাজা : সখা ! প্রেমের বৃন্দাবনে আমরা—আমি তুমি লছমী অনুরাধা, জন্ম জন্ম ধরে লীলা-সহচর-সহচরী। সেই প্রেমলোকের গান যেদিন তুমি শুনালে সেদিন আমার মনে পড়ে গেল আমার বিস্মৃত জন্মের কথা, মনে পড়ে গেল প্রেমলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণকে। তোমার গানের মন্ত্রে আমি উপাসনা করতে লাগলাম রাধা-শ্যামের যুগল মূর্তি। আমি আমার উপাস্য দেবতাকে পেয়েছি, তাই তাঁর বিরহ আর সহ্য করতে পাচ্ছি না, বন্ধু ! আমি যে আমার কানুর বাঁশরি শুনতে পেয়েছি।

বিদ্যাপতি : রাজা !

রাজা : তুমি ঠকে গেলে, বন্ধু ! তুমি গড়লে তরণি আর আমি তাই চুরি করে গেলাম বৈতরণি পেরিয়ে। বিদ্যাপতি, তুমি কাঁদছ ? কেঁদো না সখা ! তুমিও আসবে দু-দিন পরে আমাদের চিরলীলা-নিকেতন, বৈকুণ্ঠধামে। জানো বিদ্যাপতি, কাল সারারাত আমি ঘুমোইনি আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণকে ডেকেছি আর কেঁদেছি। আজ ভোরে সেই অশান্তের আহ্বান ভেসে এলো কানে। সে আমায় ডাকছে, ওরে আয় আয় ; আমার প্রিয়, আমার বুকে চলে আয়। রানি বলছিলেন রাজবৈদ্যকে খবর দিতে, এমন সময়ে এলে তুমি—ভবরোগের বৈদ্য।

একাদশ খণ্ড

রাজা : তুমি এখন গাও সখা আমার মাধবের নাম গান।

[বিদ্যাপতির গীত]

মাধব ! বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলুঁ—
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥
গনইতে দোষ গুণ- লেশ না পাওবি
যব তুঁহু করবি বিচার,
তুঁহু জগন্নাথ জগতে কহায়সি
জগ-বাহির নহি মুই ছার !
ভণয়ে বিদ্যাপতি অতিশয় কাতর
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু—
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল এক দেহ দীনবন্ধু॥

রাজা : আহা ! আবার বলো, সখা, আবার বলো !
মাধব ! তরইতে ইহ ভবসিন্ধু—
তুয়া পদ-পল্লব করি অবলম্বন
তিল-এক দেহ দীনবন্ধু ! দীনবন্ধু—
আঃ আমার মাথা কার কোলে ?

রানি : রাজা ! আমি দাসী, লছমী।

রাজা : লছমী ! ওঃ ! কে কাঁদে আমার পায়ে পড়ে ?

অনুরাধা : রাজা ! আমি—আমি অনুরাধা। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ বিষ্ণু উপাসক পরম প্রেমিক তুমি, আমায় পায়ের ধুলো দিয়ে যাও। আমি এ চরণ-ধূলির প্রসাদে মুক্ত হয়ে যাই !

রাজা : অনুরাধা ! অনুরাধা !—কী মধুর নাম ! এই তো আমার বৃন্দাবন। বিদ্যাপতি নারায়ণ, লছমী, অনুরাধা, শ্রীকৃষ্ণ নাম গান এরই মাঝে যেন জন্মে জন্মে আমি শ্রীকৃষ্ণ-মাধব (মৃত্যু)

বিদ্যাপতি : অনুরাধা

লছমী : রাজা ! রাজা !

দ্বাদশ খণ্ড

(বিসকি গ্রাম—বিদ্যাপতির ভবন—দেবীদুর্গা মন্দির)

[বিদ্যাপতির গীত]

হে নিঠুর তোমাতে নাই আশার আলো।
তাই কি তোমার রূপ কৃষ্ণ কালো ?
তুমি ত্রিভঙ্গ তাই তোমার সকলই বাঁকা,
চোখে তব কাজলের ছলনা মাখা।
নিষাদের হাতে বাঁশি সেজেছে ভালো॥

বিজয়া : দাদা ! তোমার দুটি পায়ে পড়ি, উঠে একটু কিছু মুখে দাও। আজ সাত দিন ধরে নিরম্বু উপবাস করে মায়ের মন্দিরে হত্যা দিয়ে পড়ে আছ, তুমি যোগী ভক্ত—তুমি সব পার কিন্তু আমি যে আর পারিনে, দাদা !

বিদ্যাপতি : এই সাত দিন কি তুইও কিছু খাসনি, বিজয়া ?

বিজয়া : না।

বিজয়া : দাদা। মায়ের প্রসাদ এনেছি, তাই একটু খাও।

বিদ্যাপতি : বিজয়া ! আজ আমার উপবাসের সপ্তমী, কাল অষ্টমী—সেই মহাষ্টমীতে মায়ের পায়ে আত্মবলিদান দিয়ে মায়ের হাতে প্রসাদ গ্রহণ করব। তুই এখন যা। (বিজয়ার প্রস্থান)

বিদ্যাপতি : মা যোগমায়া! পাষাণী! আর আমায় কত পরীক্ষা করবি মা! আমার যারা প্রাণের প্রিয়তম তাদের হরণ করে তাদের আর আমার মাঝে চিরবিচ্ছেদের যবনিকা টেনে দিলি। আমায় নিয়ে এ কী খেলা খেলছিস মা?

যোগমায়া : পুত্র বিদ্যাপতি! ওঠো, প্রসাদ গ্রহণ করো। এই সাত দিন ধরে তোমার সাথে আমিও উপবাসী!

বিদ্যাপতি : না আমি আহার গ্রহণ করব না—যতদিন না জানতে পারি কোন অভিশাপে আমার এই শাস্তি?

যোগমায়া : শোনো পুত্র! তোমরা সকলেই ছিলে গোলোকধামের অধিবাসী, মহাবিষ্ণুর লীলা সহচর-সহচরী। তোমরা ধরণিতে নিষ্কাম প্রেম প্রচারের করভিক্ষা করেছিলে শ্রীকৃষ্ণের কাছে, তাই পবিত্র প্রেমের ও শ্রীকৃষ্ণের কীর্তনের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছ। তোমাদের যাবার সময় হলো, বৎস। তোমাদের দেহে মনে ধরণির যে ধূলি লেগেছে তা ধুয়ে দেবেন স্বয়ং দেবী ভাগীরথী। তুমি এখনই যাও গঙ্গার পথে, সেই পথে শ্রীকৃষ্ণবিরহ কৃষ্ণ-ফণী রূপে তোমায় দংশন করবে। তার পর হবে তোমাদের চির-মিলন, মৃত্যুকে পুরোহিত করে গঙ্গার পবিত্র বক্ষে।

ত্রয়োদশ খণ্ড

[গঙ্গাবক্ষে ঝড়বৃষ্টি]

বিদ্যাপতি : কে? কে তুমি চলেছ আমার আগে আগে দীপ জ্বালিয়ে পথ দেখিয়ে?

অনুরাধা : ঠাকুর, আমি অনুরাধা!

বিদ্যাপতি : অনুরাধা! অনুরাধা! নিয়ে চলো, নিয়ে চলো আমায়! এই ঝড়বৃষ্টি? কৃষ্ণরাতের মধ্য দিয়ে সেইখানে, যেখানে আছে অনন্ত প্রেম, অনন্ত ক্রন্দন, অনন্ত অতৃপ্তি।

অনুরাধা : এসো কবি, এসো সাধক! এই অশান্ত কৃষ্ণ-নিশীথিনীর পরপারেই পাবে অশান্ত কিশোর চির-বিরহী শ্রীকৃষ্ণকে।

বিদ্যাপতি : অনুরাধা! দাঁড়াও দাঁড়াও! কে যেন আমার পা জড়িয়ে ধরেছে। উঃ রাধা! রাধা! আমায় কৃষ্ণসর্পে দংশন করেছে। জ্বলে গেল, বিষে আমার সকল দেহ জ্বলে গেল, জ্বলে গেল।

অনুরাধা : ঠাকুর! ঠাকুর! দেখছ! ওই কৃষ্ণসর্পের মাথায় কী অপূর্ব মণি জ্বলছে। ও কৃষ্ণসর্প নয় ঠাকুর, তোমায় দংশন করেছে কৃষ্ণ-বিরহ। ওই বিরহ-ফণী যাকে দংশন করে তার মুক্তির আর বিলম্ব থাকে না।

বিদ্যাপতি : অনুরাধা! অনুরাধা! কোথায় গেল অনুরাধা! চলে গেছে! আমি যাব! আবার গঙ্গার পথেই যাব। যতক্ষণ শেষ নিশ্বাস থাকে আমার ততক্ষণ ছুটব পতিতপাবনীকে স্মরণ করে। মাগো! পতিতপাবনী ভাগীরথী! আমি তোর কোলের আশায় এত পথ ছুটে এলাম, তবু তোর কোলে আমার এই পাপ-তাপিত বিষ-জর্জরিত দেহ রাখতে পারলাম না, মা। অঙ্গ আমার অবশ হয়ে এলো, আর চলতে পারি না, মা! মাকে ডেকে মৃত্যু উপেক্ষা করে সন্তান এলো এতদূর পথ, আর তুই এইটুকু পথ আসতে পারবি না মা ভক্ত ছেলের ডাকে? মা! মাগো!

গঙ্গা : বিদ্যাপতি!

বিদ্যাপতি : এ কী—মকরবাহিনী কলুষনাশিনী মাগো—তবে কি সন্তানের অন্তিম প্রার্থনা শুনেছিস মা! আঃ! আমার প্রাণ-মন-দেহ জুড়িয়ে গেল মা, তোর মাতৃকরস্পর্শে।

গঙ্গা : বিদ্যাপতি, আমি এসেছি তোমাদের নিয়ে যেতে, তোমাদের আপন গেহে, নন্দনলোকে। ওই তোমার লছমী অনুরাধা সাথে আসছে—বৎস, তোমাদের লীলা শেষ, কার্য শেষ। শ্রীকৃষ্ণের লীলা-সাথী—তোমরা যুগে যুগে আস, ফিরে চলো বৎস তাঁর প্রেমময় কোলে।

[অনুরাধার গীত]

সজনী আজু শমন দিন হয়।

চতুর্দশ খণ্ড

[অনুরাধার গীত]

সজনী আজু শমন দিন হয়।
নব নব জলধর চৌদিকে ঝাঁজিল
প্রাণ দেহে নাহি রয়॥
বরষিছে পুনঃ পুনঃ অগ্নিদাহন যেন
জানিনু জীবন লয়।

[বিদ্যাপতির গীত]

বিদ্যাপতি কহে শুন শুন লছমী
মরণে মিলন মধুময়॥

লছমী : কে? বিদ্যাপতি?

বিদ্যাপতি : লছমী? তুমি?

অনুরাধা : হ্যাঁ ঠাকুর! আমি নিয়ে এসেছি তোমার জীবন-মরণের সাথি লছমীকে। পবিত্র সুরধুনী-ধারায় স্নাত হয়ে তোমরা উভয়ে হলে নির্মল, তাই তো মা পতিতপাবনীর কোলে হলো তোমাদের মিলন।

[গীত]

শেষ হলো মোর কাজ, হে কিশোর! আমারে লহো এবার।

লছমী : অনুরাধা! সখি! কোথায় চলছিস তুই? তুই কি আমাদের ছেড়ে এমনি দূরে দূরেই ভেসে যাবি?

অনুরাধা : লছমী! সখি! আমি যেন জন্মে-জন্মে কালস্রোতে ভেসে এমনই যুগলমিলন দেখে মরতে পারি।

[গীত]

তোমার যাহাতে সুখ তাহে আমার সুখ
সুন্দর মাধব হমার।
কোটি জনম যেন তুহার সুখের লাগি
ডারি দেই এ জীবন ছার॥